মহাযান সম্প্রদায়ের সাধনার গান বা ধর্ম্ম-সঙ্গীত। গানগুলির বাহিরের অর্থ মোটামুটিভাবে বেশ সহজই, বুঝিতে বেশি কষ্ট হয় না। কিন্তু এগুলির একটি আধ্যাত্মিক গূঢ় অর্থ আছে, উহা বোঝা কঠিন। বৌদ্ধগানের ভাষার সামান্য একটু নমুনা দিতেছি—

কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল।
চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥

কায়ারূপ (দেহরূপ) বৃক্ষের পাঁচটি শাখা। চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হইল।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই।
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ।

কচ্ছপকে দুহিয়া (উহার দুধ) পাত্রে ধরা যায় না। গাছের তেঁতুল কুমীরে খায়।

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।

ভবনদী গহন গম্ভীর বেগে প্রবাহিত হয়।

উঁচা উঁচা পাবত, তঁহি বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ শবরী, গিবত গুঞ্জরী মালী ॥

উঁচু উঁচু পর্ব্বত,—সেখানে ব্যাধবালিকা বাস করে। সেই ব্যাধবালিকা ময়ূরের পুচ্ছ পরিহিতা (শোভিতা), তাহার গলায় গুঞ্জা ফলের মালা।

চর্য্যাগান রচয়িতারা সিদ্ধাচার্য্য নামে পরিচিত। লুই, কাহ্নু, শান্তি, শবর, বীণা, সরহ প্রভৃতি ২৪ জন সিদ্ধাচার্য্যের রচিত গান এই বৌদ্ধগানে রহিয়াছে। এই গানসকল ধাঁধার আকারে হেঁয়ালির ধরণে লেখা। সেইজন্য এই সকল গানের অর্থ সর্ব্বত্র বেশ সুস্পষ্ট নহে। প্রায় প্রত্যেকটি গানেই একটি দুইটি বা ততোধিক প্রবচন আছে। সেই প্রবাদ বা প্রবচনের সাহায্যে সাধক কবিরা বৌদ্ধ মহাযান সম্প্রদায়ের সাধনার কথা স্পষ্ট করিতে চাহিয়াছেন। যেমন, আপনা মাঁসে হরিণা বৈরী—নিজের মাংসে হরিণ শত্রু; অথবা—দুহিল দুধ কি বেণ্টে সামায়—দোহা দুধ কি পুনরায় বোঁটায় প্রবেশ করে?—এইরূপ প্রবচনের ছড়াছড়ি বৌদ্ধগানে দেখা যায়।

চর্য্যাগানগুলি ধর্ম্ম-সঙ্গীত। সেইজন্য ইহাদের মধ্যে কবিত্বের আভাস বড় একটা পাওয়া যায় না। অবশ্য জায়গায় জায়গায় কবিত্বের পরিচয় যে রচয়িতাদের অজ্ঞাতসারে প্রকাশ পায় নাই, এমন কথা বলা যায় না।

বৌদ্ধগানগুলি নেপালের রাজদরবারের পুঁথিশালায় বহুকাল অলক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া ছিল। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সেই পুঁথিশালা হইতে এগুলি আবিষ্কার করিয়া প্রচার করিয়া বাঙ্গালীর চির-কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

চণ্ডীদাস

বৌদ্ধগানের পরে বাংলা সাহিত্যের যে বইখানির উল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। ইহার রচয়িতা চণ্ডীদাস। প্রাচীনতায় বৌদ্ধগানের পরেই চণ্ডীদাসের লেখা এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। এই বইখানিও কাব্যের আকারে লেখা।

এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, এদেশে ইংরাজ আগমনের আগে পর্য্যন্ত বাংলায় যত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, সবই কবিতায় রচিত। প্রাচীন এবং মধ্য-যুগের সাহিত্যে বাংলা গদ্যের উদ্ভব হয় নাই। বাংলা গদ্যের উদ্ভব অপেক্ষাকৃত আধুনিককালেই হইয়াছিল। সুতরাং প্রাচীন ও মধ্য যুগের সমস্ত বই-ই কবিতার আকারে রচিত—গদ্যে রচিত নয়।

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন রাধাকৃষ্ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া লিখিত। চণ্ডীদাস এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যখানি ছাড়া অনেক খণ্ড খণ্ড কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন। সেগুলিও রাধাকৃষ্ণের কাহিনী লইয়া লেখা। ঐ সকল কবিতা পদাবলী নামে পরিচিত। চণ্ডীদাসের পদাবলীর ভাব, ভাষা, ছন্দ, উপমা ও বর্ণনাকৌশল অপূর্ব্ব। পদাবলীতে চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অনেক লীলাই বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার বাল্যলীলা, গোষ্ঠলীলা এ সবই তিনি পদাবলীতে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে রাধাকৃষ্ণের লীলা যে সকল

পদাবলীর বর্ণনার বিষয়, সেই সকল পদেই চণ্ডীদাসের কবিত্ব যেন শতমুখে শতধারায় উৎসারিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন যে, "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের প্রধান গৌরব ইহার পদাবলী সাহিত্য।" একথা খুবই সত্য। চণ্ডীদাস এই পদাবলী সাহিত্যের আদি কবি এবং পদাবলী-রচয়িতা কবি হিসাবে তাঁহার স্থান খুব উচ্চে। সেই হিসাবে চণ্ডীদাসকেই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পদাবলী-রচয়িতা কবি বলিতে হয়। কিন্তু পদাবলী-রচয়িতা কবি হিসাবে যে-চণ্ডীদাসের এত যশ, তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু জানা গিয়াছে, তাহাতে আমরা জানিয়াছি যে, তিনি খুব সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতকে জন্মিয়াছিলেন। এখন বাংলার যে অঞ্চলকে পশ্চিম বঙ্গ বলা হয়—প্রাচীনকালে তাহার নাম ছিল 'রাঢ়'। সেই রাঢ়ের বীরভূম জেলার নান্নুর গ্রামে এক ব্রাহ্মণ বংশে কবি চণ্ডীদাসের জন্ম হয়। চণ্ডীদাস নান্নুরের 'বিশালাক্ষী' বা বাশুলী দেবীর পূজারী ছিলেন। বাশুলী বীণাপাণি বা সরস্বতীরই অন্য নাম। চণ্ডীদাসের পূজিতা দেবী 'বাগীশ্বরী', বাশুলী বা বিশালাক্ষী, নান্নুরে আজিও পূজা পাইতেছেন। এই মূর্ত্তি চতুর্ভুজা। দুই হাতে তিনি বীণা বাজাইতেছেন। তাঁহার বাকী দুই হাতের এক হাতে পুঁথি, অপর হাতে জপমালা।

চণ্ডীদাস সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিতও ছিলেন। কিন্তু তাঁহার যশ পাণ্ডিত্যের জন্য নহে, কবিত্বের জন্য। চণ্ডীদাসের কবিতায় দেবতার লীলাকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাই তাঁহার কবিতা মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে মর্ত্ত্যের সীমার বাহিরে নির্মল এক অধ্যাত্মরাজ্যে লইয়া যায়। কিন্তু ভগবানের লীলা-বর্ণনা চণ্ডীদাসের কবিতার বিষয় হইলেও তিনি মর্ত্ত্যের ধূলি-লাঞ্ছিত মানুষকে কখনও বিস্মৃত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।

মানুষের প্রতি তাঁহার এই অকপট ভালবাসাই তাঁহার কাব্যের সর্ব্বোত্তম বৈশিষ্ট্য।

বাংলা সাহিত্যে শূন্যপুরাণ, গোরক্ষবিজয় আর গোপীচন্দ্রের গান বা ময়নামতীর গান নামে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ আছে। এই বইগুলিও কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন যুগের—অর্থাৎ চর্য্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের যুগের রচনা। কিন্তু কেহ কেহ মনে করেন যে, এগুলি অনেক পরবর্ত্তীকালের লেখা, হয়ত সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের লেখা বই।

কৃত্তিবাস ও বাংলা রামায়ণ

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগে যে সকল কাব্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় হইতেছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ। এই রামায়ণখানি দরিদ্রের পর্ণকুটীর হইতে আরম্ভ করিয়া ধনীর প্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই সমান আদরের সহিত পঠিত হইয়া থাকে। কৃত্তিবাসের এই রামায়ণ-রচনার কাহিনী গল্পের মতই চিত্তাকর্ষক।

বাংলাদেশে তখন হিন্দু রাজার রাজত্বকাল। প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা দনুজমর্দ্দন গণেশ তখন বাংলার সিংহাসনে। তিনি জ্ঞানী ও গুণীর সমাদর করেন—অসংখ্য জ্ঞানী আর গুণিজনে তাঁহার সভা পরিপূর্ণ। কতশত পণ্ডিত আর প্রার্থী যে প্রতিদিন তাঁহার প্রাসাদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। রাজা তাঁহাদিগের কাহাকেও বিমুখ করেন না। সকলকেই মুক্তহস্তে সাহায্য করিয়া খুশী করিয়া বিদায় দেন।

একদিন সকালে এই রাজা গণেশের সিংহদ্বারে এক গরীব ব্রাহ্মণ-যুবক আসিয়া হাজির হইলেন। যুবক অল্প কিছুদিন হইল গুরুগৃহ হইতে শিক্ষা শেষ করিয়া বাহির হইয়াছেন।—এখন তাঁহার সাধ,—তিনি রাজার সভাকবি হইবেন। এই যুবকই কবি কৃত্তিবাস।

কৃত্তিবাস যখন রাজা গণেশের সিংহদ্বারে দ্বারীর সম্মুখে দাঁড়াইলেন, তখন পাণ্ডিত্যের ও কবিত্বের প্রভায় তাঁহার চোখদুটি জলজল করিতেছে। তিনি একটি ভূর্জ্জপত্রে পাঁচটি শ্লোক লিখিয়া মহারাজকে উপহার দিবার জন্য দ্বারীকে দিলেন। শ্লোকগুলিতে রাজা গণেশের প্রশংসা করা ছিল।

কত শত প্রার্থীই ত এমনিভাবে রাজসন্দর্শনে আসিয়া থাকে! সুতরাং যুবকের শ্লোক পাইয়া দ্বারীর কোন ভাবান্তরই দেখা গেল না। সে যথারীতি শ্লোকগুলি লইয়া রাজার কাছে পৌছাইয়া দিতে গেল। রাজা তখন পাত্রমিত্র সমভিব্যাহারে রাজসভায়।—ব্রাহ্মণ যুবক কৃত্তিবাস সিংহদ্বারের বাহিরে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল পরেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া দ্বারী ফিরিয়া আসিয়া হাঁকিল—

কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস ?
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ।

ফুলিয়াগ্রামনিবাসী কৃত্তিবাস মুখটি কাহার নাম? শীঘ্র আসিয়া রাজার সহিত সাক্ষাৎ করুন।

কৃত্তিবাস এই আহ্বানে আগাইয়া আসিলেন। দ্বারী তাঁহাকে রাজসভায় পৌছাইয়া দিল। রাজসভায় পৌছিয়া কৃত্তিবাস দেখিলেন সেখানে ভারত-বিখ্যাত কত শত প্রবীণ বিচক্ষণ পণ্ডিত বসিয়া আছেন। দেখিয়া কৃত্তিবাসের বুক দুরুদুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই নিজেকে সামলাইয়া লইয়া নিজের কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যের পরীক্ষা দিবার জন্য সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া মুখে মুখে শ্লোক রচনা করিয়া তিনি আবৃত্তি করিলেন। প্রত্যেকটি শ্লোকেই রাজা গণেশের বন্দনাগান। রাজা তাহা শুনিয়া কৃত্তিবাসের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। মোহিত হইয়া তিনি কৃত্তিবাসকে মাল্য চন্দন, পট্টবস্ত্র, অর্থ প্রভৃতি দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। এত দান করিয়াও রাজার আশ মিটিল না। তিনি কৃত্তিবাসকে বাল্মীকি-রচিত সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করিতে অনুরোধ করিলেন এবং সেই কার্য্যের জন্য কবির উপযুক্ত বৃত্তিরও ব্যবস্থা করিলেন। কৃত্তিবাসকে রাজা গণেশ তাঁহার সভাকবির পদে

বরণ করিলেন। কৃত্তিবাসের মনের সাধ পরিপূর্ণ হইল। তিনি বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদ করিয়া সপ্তকাণ্ড রামায়ণকাব্য রচনা করিলেন।

কত শত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, তবু এই কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তা আজিও এতটুকু কমে নাই। আজিও মিতব্যয়ী বণিক অকাতরে তাহার দোকানের ছোট্ট প্রদীপটি তেলে পূর্ণ করিয়া তাহার পিতৃপিতামহের আমলের শতছিন্ন রামায়ণখানি একবার মাথায় ঠেকাইয়া তারপর পরম ভক্তির সহিত অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া পাঠ করিয়া থাকে। সেই সময়ে তাহার চারিদিকে মধুলোভাতুর মৌমাছির মত গৃহের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা অথবা পাড়া-প্রতিবেশীরা আসিয়া জোটে, আর রামের তাড়কা রাক্ষসী বধ করার কথা, হরধনুভঙ্গের বিবরণ অথবা রাম-রাবণের যুদ্ধের কাহিনী কিংবা হনুমানের বীরত্ব ও প্রভুভক্তির বর্ণনা শুনিয়া তাহাদের অন্তর আনন্দে ও বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। তারপর পড়া শেষ হইয়া গেলে, যে পাতা পর্য্যন্ত পড়া হইল, সেখানে একটি তেজপাতার চিহ্ন দিয়া সে বইখানি মুড়িয়া রাখে। ধনীর প্রাসাদে উজ্জ্বল দীপালোকে ধনিগণও সমান ভক্তি ও অনুরাগের সহিত এই কৃত্তিবাসী রামায়ণখানি যুগযুগান্তর ধরিয়া পাঠ করিয়া আসিতেছেন।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে যে কয়জন কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে পদাবলীর কবি চণ্ডীদাস, আর রামায়ণের কবি কৃত্তিবাসই বাঙ্গালীর কাছে সবচেয়ে প্রিয় কবি। চণ্ডীদাস বর্ণনা করিয়াছেন শ্রীকৃষ্ণের লীলা, আর কৃত্তিবাস বর্ণনা করিয়াছেন শ্রীরামচন্দ্রের জীবনের মাহাত্ম্য। চণ্ডীদাসের কবিতার মূল সুর ভগবৎপ্রেম। কৃত্তিবাসের কবিতার মূল সুর ভক্তি। রামের প্রতি ভক্তি প্রচারই কবির উদ্দেশ্য। রামকে কবি কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে ভক্তবৎসল দেবতারূপে আঁকিয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া, রামায়ণে শিক্ষার বিষয়ও অনেক আছে। ভগবদ্‌ভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, পতিভক্তি, বীরধর্ম্ম, পিতৃভক্তি—এ সমস্তই বাঙ্গালী কৃত্তিবাসের রামায়ণ পড়িয়া শিখিয়াছে। আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের নীতি, আমাদের ইতিহাস,—অর্থাৎ আমরা কি মানি,

কি ভাবে চলি বা কি ভাবে আমাদের চলা উচিত, আগে আমাদের দেশে কি ছিল,—এ সমস্ত কথাই আমরা ঐ কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতেই শিখিয়াছি। এই কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙ্গালীকে মনুষ্যত্বে মহীয়ান্ হইতে শিক্ষা দিয়াছে। রামচন্দ্রের পিতৃসত্য পালনের জন্য বনগমন, লক্ষ্মণের অপূর্ব্ব ভ্রাতৃভক্তি, ভরতের কর্ত্তব্যপরায়ণতা ও ভ্রাতৃপ্রীতি, শত্রুঘ্নের ভরতের প্রতি ভালবাসা, সীতার পতিভক্তি, হনুমানের প্রভুভক্তি, দশরথের সত্যরক্ষা ও পুত্রস্নেহ, লবকুশের রামায়ণ-গানের সুমধুর ও সুকোমল কথা যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালীকে একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দিয়াছে। এ ছাড়া, এই কৃত্তিবাসী রামায়ণকে ভিত্তি করিয়া বাংলা সাহিত্যের কত কবি যে পরবর্ত্তীকালে কত কবিতা ও কাব্য রচনা করিয়াছেন তাহারও ইয়ত্তা নাই। সুতরাং এই রামায়ণ একদিকে বাঙ্গালীকে শিক্ষা দিয়াছে, আনন্দ দান করিয়াছে,—অপর দিকে বাংলার কবিদিগকে রচনার উপকরণ জোগাইয়াছে।

কৃত্তিবাস বাল্মীকির লেখা সংস্কৃত রামায়ণের বাংলা অনুবাদ করেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুবাদ হইলেও ইহা মূল রামায়ণের আক্ষরিক বা হুবহু অনুবাদ নহে। মূল গল্পকে অবলম্বন করিয়া কৃত্তিবাস এক স্বতন্ত্র রামায়ণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। সেকালে অনুবাদ অর্থে ঠিক প্রতিটি কথার অর্থ বসাইয়া যাওয়া বুঝাইত না। তাই কৃত্তিবাসও বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করিতে গিয়া প্রতিটি কথার অর্থ বসাইয়া যান নাই। অনেক জায়গায় তিনি বাড়াইয়াছেন, অনেক জায়গায় কমাইয়াছেন ; আবার অনেক জায়গায় নিজের কল্পনার দ্বারা চরিত্র অথবা ঘটনাকে নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া লইয়াছেন। সেইজন্য কৃত্তিবাসী রামায়ণ মূলতঃ অনুবাদ-কাব্য হইলেও ইহার অনেকখানিই কবির নিজস্ব সৃষ্টি। এই কারণে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও বাল্মীকি রামায়ণের মধ্যে পার্থক্য খুবই স্পষ্ট।

বাল্মীকি-রামায়ণে রামচন্দ্র বীর। বাল্মীকি লিখিয়াছেন যে, কঠোরতায় ও দৃঢ়তায় রামচন্দ্র এক বিশাল পুরুষ। তাঁহার বাহু লোহার শাবলের মত কঠিন। গুহক চণ্ডালের আশ্রমে তিনি তাঁহার সেই কঠিন হাতের উপর

মাথা রাখিয়া রাত্রিতে নিদ্রা গিয়াছিলেন। ফলে মাটির উপরকার তৃণসকল তাঁহার হাতের চাপে শুকাইয়া পিঙ্গলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই রামের চিত্ত যে শিরীষ ফুলের মত কোমল ছিল, সে কথাও বাল্মীকি বলিয়াছেন। এক কথায় বলিতে গেলে, বাল্মীকির রাম কোমলতা ও কঠোরতার সমন্বয়ে রচিত। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার দেহ—"নবনী জিনিয়া তনু অতি সুকোমল"। মূল রামায়ণে আছে যে, ধনুষ্পাণি রামচন্দ্রের কঠিন করাল মূর্ত্তি তাড়কা ও মারীচ রাক্ষসের মনে ভীষণ একটা ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্রের বর্ণনায় কৃত্তিবাস বলিতেছেন—ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে। ইহাতে রামের বীরমূর্ত্তি পরিস্ফুট হয় নাই, তাঁহার কোমল মূর্ত্তিটিই ফুটিয়া উঠিয়াছে।

কৃত্তিবাস বাঙ্গালী কবি ছিলেন। তিনি জানিতেন যে, বাঙ্গালী কোমল ভাবের ভাবুক, কোমলতার উপাসক। তাই তিনি তাঁহার রামকে শ্যামসুন্দর পল্লবের মত স্নিগ্ধ কোমল করিয়া গড়িয়াছেন। রামের কঠোর চিত্রটি পাছে বাঙ্গালীর নিকট প্রিয় না হয় এই জন্যই তিনি রামের কোমলতাটুকুকেই ফুটাইয়া তুলিয়া গিয়াছেন এবং বাস্তবিকপক্ষে এই কোমল-মধুরতার জন্যই কৃত্তিবাসী রামায়ণের রামের চিত্র বাঙ্গালীর এত প্রিয় হইয়াছে।

বাল্মীকি-রামায়ণে কবি শুধু রামচন্দ্রের চরিত্রে নহে, লক্ষ্মণ সীতা প্রভৃতির চরিত্রেও একটা ক্ষাত্র তেজ পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামের মত ঐ সকল চরিত্রও কোমল মাধুর্য্যে মণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। কৃত্তিবাস ইঁহাদিগকেও কুসুম-সুকুমার করিয়া গড়িয়াছেন। কৃত্তিবাস তাঁহার রামায়ণে শুধু চরিত্রগুলিকেই কোমল করিয়া আঁকেন নাই। তিনি সমস্ত রামায়ণখানির ঘটনাস্রোতের মধ্যেও একটা করুণ ভাবের ধারাকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছেন। এই কারণেই কৃত্তিবাসী রামায়ণ এত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

কৃত্তিবাস বাল্মীকি হইতে শুধু কাব্যের কাঠামোটাই লইয়াছিলেন এবং উহা লইয়া বাঙ্গালীর ভাবের ও মনের অনুরূপ করিয়া রামায়ণের কাহিনী

আর চরিত্রসকল তিনি জায়গায় জায়গায় রূপান্তরিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার রামায়ণকাব্যের আদর বাঙ্গালীর কাছে চিরদিন সমান রহিয়াছে।

কৃত্তিবাস বাংলা রামায়ণের আদি কবি। কৃত্তিবাসের পরে আরও অনেক কবি বাংলায় রামায়ণ কাব্যের অনুবাদ করেন। অনেকে আবার রামায়ণের অংশ-বিশেষেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কবিচন্দ্র, জগৎরাম বন্দ্য, রামপ্রসাদ বন্দ্য, শিবচন্দ্র সেন প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী জনৈক মহিলা-কবিও রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম—চন্দ্রাবতী। চন্দ্রাবতীর কবিত্বশক্তি বেশ উঁচুদরের ছিল। তিনি কাব্য রচনা করিয়া এবং ধর্ম্মকর্ম্মেই তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইঁহার আবির্ভাবকাল খৃষ্টীয় ষোড়শ শতক।

কৃত্তিবাসের পরে অনেক রামায়ণ রচিত হইয়াছিল সত্য এবং সেই সকল রামায়ণের কোন কোন অংশের বর্ণনা কৃত্তিবাসের চেয়ে মধুর—ইহাও সত্য। তবু সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত অন্য কোন রামায়ণই অত উৎকৃষ্ট হয় নাই। তাই কৃত্তিবাসের যশ তাঁহার পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত কোন কবি ম্লান করিতে পারেন নাই।

মালাধর বসু ও শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য

কৃত্তিবাসের রামায়ণের পরেই চৈতন্যপূর্ব্ব যুগের যে কাব্যখানির নাম বিশেষভাবে করিতে হয়, তাহা হইতেছে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য'। রামায়ণে আছে রাম লক্ষ্মণ ও সীতার কাহিনী, মহাভারতে কুরুপাণ্ডবের কথা, আর ভাগবতে আছে শ্রীকৃষ্ণের কথা। কৃষ্ণকথা বাঙ্গালীর অতিশয় প্রিয়। তাই বাংলাদেশে এমন এক সময় ছিল যখন কানু ছাড়া বাংলার কবিরা আর কোনো গান বাঁধিতে চাহিতেন না।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যখানি মালাধর বসু নামক কবির লেখা। এই কাব্যখানি সংস্কৃত ভাগবত অবলম্বন করিয়া লিখিত। কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেমন বাল্মীকি-

রামায়ণের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় তেমনি সংস্কৃত ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ নয়। অনুবাদ হইলেও এই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের অনেকখানিই কবির নিজস্ব সৃষ্টি।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মধ্যে এই বইখানির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, কবি ইহাতে তাঁহার কাব্য-রচনার তারিখটি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ কবির আবির্ভাবকাল এবং তাঁহাদের গ্রন্থরচনার তারিখ অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া স্থির করিতে হয়। কিন্তু মালাধর বসু বলিতেছেন—

তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে গ্রন্থ সমাপন॥

১৩৯৫ শকে অর্থাৎ ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থখানি কবি রচনা করিতে আরম্ভ করেন, আর ১৪০২ শকে অর্থাৎ ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে এই বই তিনি শেষ করেন।

বাংলা সাহিত্যের আর কোন প্রাচীন কবিই এমন স্পষ্টভাবে তাঁহার গ্রন্থ রচনার তারিখ লিখিয়া যান নাই। এইজন্য বৌদ্ধগানের রচনাকাল, চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল বা তাঁহার লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের-রচনাকাল, কৃত্তিবাসের আবির্ভাবকাল—এ সবই আমাদিগকে অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া ঠিক করিতে হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়-রচনাকালের সঠিক পরিচয় কবি মালাধর বসু তাঁহার কাব্যমধ্যে স্পষ্ট করিয়াই দিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কবি মালাধর বসুর উপাধি ছিল 'গুণরাজ খান'। এই উপাধি তিনি বাংলার কোন এক সুলতানের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। সেকালে মুসলমান সুলতানেরা যে কিরূপ জ্ঞানী, গুণী ও পণ্ডিতের আদর করিতেন, তাহা ইহা হইতেই জানা যায়।

মঙ্গলকাব্য

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই এক শ্রেণীর কাব্য রচিত হইত। উহা মঙ্গলকাব্য নামে বিখ্যাত। এই ধরণের কাব্যের মধ্য দিয়া বিভিন্ন কবি বিবিধ দেবদেবীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গলকাব্য-সকল দেবদেবীর মহিমাগান ও পূজাপ্রচারের জন্যই রচিত হইয়াছিল।

যে সকল দেবতার পূজা সমাজে প্রচলিত ছিল না, তাঁহাদিগকে মঙ্গলকারী এবং শক্তিশালী ও জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রচার করিবার জন্য ও তাঁহাদের পূজা প্রচার করার জন্য মঙ্গলকাব্যগুলি রচিত হইয়াছিল। চণ্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতি অনেক দেবদেবীকে লইয়াই মঙ্গলকাব্য লেখা হয়। এক একটি মঙ্গলকাব্যে বিশেষ একটি দেবতাকে মঙ্গলকারী ও শক্তিশালী দেবতারূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। চণ্ডীর মহিমা কীর্ত্তন করিয়া যে মঙ্গলকাব্য রচনা করা হইয়াছিল তাহা 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত, মনসার মহিমা গান করিয়া যে সকল মঙ্গলকাব্য লেখা হইয়াছিল সেগুলি 'মনসামঙ্গল' বা 'পদ্মাপুরাণ' নামে বিখ্যাত। শীতলা, ষষ্ঠী প্রভৃতিকে জাগ্রত মঙ্গলকারী দেবতা বলিয়া যে সকল কাব্যে বর্ণনা করা হইয়াছিল, সেগুলি যথাক্রমে 'শীতলামঙ্গল' ও 'ষষ্ঠীমঙ্গল' কাব্য নামে খ্যাত হইয়াছে। এইরূপ 'গঙ্গামঙ্গলে' গঙ্গামহিমা, 'কৃষ্ণমঙ্গলে' কৃষ্ণমহিমা, 'দুর্গামঙ্গলে' দেবী দুর্গার মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে। বাংলাদেশে বিশেষতঃ দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে চিরকাল বাঘের বড় ভয়। তাই সে অঞ্চলে দক্ষিণরায় নামে এক দেবতা কল্পিত হইয়াছিলেন। এই দক্ষিণরায়ের কাহিনী লইয়াও মঙ্গলকাব্য সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার নাম 'রায়মঙ্গল'।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাহিনী খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। এইজন্য একজন কবির পর অন্য একজন কবি—এমনি করিয়া কত কবি যে এক মনসা এবং চণ্ডীর মহিমা গান করিয়া কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যেরও একাধিক কবি পাওয়া গিয়াছে।

মনসামঙ্গল কাব্য

সাপের দেবী মনসা। মনসামঙ্গল কাব্যে এই সাপের দেবীর মহিমার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। জনসমাজে কেন যে সাপের দেবী কল্পিত হইয়াছিলেন অথবা কেন যে তাঁহার পূজা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা কঠিন নহে।

সাপ মানুষের শত্রু। প্রতিবৎসর কত শত লোক এই সাপের কামড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়! সেইজন্য সাপের দেবতা মনসার পূজার দ্বারা তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়া সর্পদংশনের বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবার কথা মানুষের মনে হইয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশেই সাপের পূজা একসময়ে ছিল বা এখনও কোথাও কোথাও আছে। সাপের দেবতাকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়াই সাপের দেবতা মনসার পূজা এই বাংলাদেশে একদিন প্রচলিত হইয়াছিল, এবং আজও সর্পদেবতা মনসার পূজা বাংলায় প্রচলিত রহিয়াছে।

মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী আছে। চাঁদ সদাগর বা চাঁদ বেণে এই মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক। চম্পকনগর নামে একটি সমৃদ্ধিশালী জনপদ। চাঁদ সদাগর সেখানকার অধিপতি, বাণিজ্য করিয়া তিনি চম্পকনগরের অধিপতি হইয়াছেন। তিনি শিবের উপাসক। অন্য কোন দেবতার পূজা তিনি তাঁহার কল্পনাতেও স্থান দিতে পারেন না। অথচ এই চাঁদবেণে মনসার পূজা না করিলে মনসার পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হয় না।

সুতরাং মনসাদেবী চাঁদসদাগরের পূজা পাইয়া পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা সুরু করিলেন। কিন্তু মনসা দেবীর পূজা করা দূরে থাকুক, চাঁদসদাগর মনসার প্রতি অতিশয় ঘৃণা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সদয় ব্যবহারে মনসা যখন চাঁদের ভক্তি লাভ করিতে অক্ষম হইলেন, তখন তিনি চাঁদের সঙ্গে বিষম শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দিলেন,—চাঁদের পূজা না পাইয়া তাঁহার কোপ হইল।

কিন্তু কোপ হইলেও মনসা দেবী প্রথমটায় চাঁদের কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না। কারণ চাঁদবেণে 'মহাজ্ঞান' নামে এক অলৌকিক শক্তির

অধিকারী ছিলেন। এই ক্ষমতাবলে তিনি সর্পদষ্ট লোকদের আরোগ্য করিতে পারিতেন। কুপিতা মনসার আদেশে যখন কোন সাপ চাঁদের কোন ছেলেকে দংশন করিত, তখন তিনি এই মহাজ্ঞানের বলে ছেলেকে বাঁচাইয়া তুলিতেন। সুতরাং বিরোধ করিয়া চাঁদের সঙ্গে মনসাদেবী বিশেষ আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তাই একদিন মায়াবলে চাঁদকে ভুলাইয়া মনসাদেবী তাঁহার 'মহাজ্ঞান' হরণ করিয়া লইয়া গেলেন—চাঁদের জীবনে বিপদ ঘনাইয়া আসিল।

কিন্তু তবু চাঁদ অটল, অচল—শঙ্কর গারুড়ী নামে তাঁহার এক বৈদ্য বন্ধু ছিলেন। তিনি সাপের বিষের খুব ভাল ঔষধ জানিতেন। যে কোন বিষাক্ত সাপই দংশন করুক না কেন, তিনি সেই সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে নিরাময় করিতে পারিতেন। সুতরাং 'মহাজ্ঞান' হারাইলেও চাঁদ ইঁহার সাহায্যে তাঁহার কোন পুত্রকে সাপে কামড়াইলেই, রক্ষা করিতেন।

মনসা দেবী দেখিলেন মহা বিপদ! শঙ্কর গারুড়ীকে বশ না করিলে নয়। কিন্তু শত চেষ্টাতেও শঙ্কর গারুড়ী বশ মানিলেন না। মনসা তখন দুইজনের বন্ধুত্ব ভাঙ্গিবার চেষ্টা সুরু করিলেন। কিন্তু চাঁদ ও গারুড়ীর বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম। তাই বন্ধুত্ব ভাঙ্গিবার কৌশলও মনসার ব্যর্থ হইল। তখন মনসা কৌশলে গারুড়ীর প্রাণনাশ করিলেন। এইবার চাঁদ সদাগর একেবারে অসহায় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তবু তিনি মনসার কাছে নতিস্বীকারের কথা বারেকের জন্যও চিন্তা করিলেন না। অসহায় চাঁদ একমাত্র তাঁহার পৌরুষকে অবলম্বন করিয়া শিবকে স্মরণ করিয়া বিপদের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

এইবার মনসার কোপে চাঁদ সদাগরের দুঃখ-দুর্দ্দশা আর দুর্গতির অন্ত রহিল না। মনসার ক্রোধে একে একে তাঁহার ছয় ছেলে সাপের কামড়ে বিনষ্ট হইল। চাঁদ সদাগরের স্ত্রী সনকা পুত্রহীন হইয়া কত কাঁদিলেন, কাঁদিতে কাঁদিতে মনসার সহিত বাদ করিতে স্বামীকে কত নিষেধ করিলেন। চাঁদের মনও পুত্রশোকে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতেছিল। কিন্তু পত্নী সনকার মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, নিজের অন্তরের উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ—সমস্তই তিনি

উপেক্ষা করিয়া মনসার শত্রুতার প্রতিশোধ লইবার জন্য দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইলেন।

গৃহে পত্নীর মর্ম্মভেদী ক্রন্দন, আত্মীয়-স্বজনের করুণ বিলাপ! চাঁদের মনও এই সকল বিলাপ শুনিয়া পুত্রশোক ভুলিতে পারিতেছিল না। তাই তিনি বাণিজ্য-যাত্রা করিলেন। সাতখানি বড় বড় ডিঙ্গা বাণিজ্যের উপকরণে পরিপূর্ণ হইল। শত শত নাবিকের কোলাহলে বাণিজ্যতরীগুলি মুখরিত হইয়া উঠিল। চাঁদ সদাগর নিজে গিয়া উঠিলেন 'মধুকর' নামে একটি ডিঙ্গায়। এই 'মধুকর'—সাত ডিঙ্গার মধ্যে সব চেয়ে বড়,—ইহা যেন একখানি ভাসমান রাজপ্রাসাদ। ইহাতে কারুকার্য্যই বা কত!

সনকা প্রভৃতি পুরনারীরা চোখের জলে চাঁদ সদাগরকে বিদায় দিলেন। 'মধুকর'-সহ সপ্তডিঙ্গা উজান বাহিয়া ভাসিয়া চলিল।

ডিঙ্গাগুলি সাগরে পৌছিলে, মনসাদেবীর আদেশে ভীষণ ঝড় উঠিল। সেই ঝড়ে একে একে সব কয়খানি ডিঙ্গা লক্ষ লক্ষ টাকার বাণিজ্যসম্ভার লইয়া ডুবিয়া গেল। অমন যে রাজপ্রাসাদের মত 'মধুকর'—তাহাও ডুবিয়া গেল। চাঁদ সদাগরের সঙ্গে যে সব বণিক বাণিজ্যযাত্রা করিয়াছিল, তাহারাও যে কে কোথায় গেল, অথবা ডিঙ্গাগুলির মাঝিমাল্লারা যে কে কোথায় গেল, তাহার কোন খোঁজ-খবর পাওয়া গেল না। চাঁদ সদাগর সমুদ্রের লোণা জলে পড়িয়া প্রায় অজ্ঞান হইলেন।

এই অবস্থায় মনসা দেবী কয়েকটি পদ্মফুল জলে ফেলিয়া দিলেন। উদ্দেশ্য, সেই ফুল কয়টি অবলম্বন করিয়া চাঁদ তাঁহার প্রাণ রক্ষা করুন। কারণ চাঁদকে মারিবার ইচ্ছা মনসার নাই। চাঁদকে মারিলে দেবীর পূজা প্রচার হয় না।

চাঁদ রাত্রির অন্ধকারে বিদ্যুতের ঈষৎ আলোয় সেই পদ্মফুলের স্তূপ দেখিয়া উহাকে আশ্রয় মনে করিয়া হাত বাড়াইলেন। কিন্তু পদ্মফুল স্পর্শ করিয়া তাঁহার মনে পড়িয়া গেল মনসার কথা—মনসার আর এক নাম যে পদ্মা! তাই তখনই তিনি হাত সরাইয়া লইলেন। মনসার কৃপায় বাঁচিবার সাধ তাঁহার নাই। তিনি মনসার কৃপার ভিখারী নহেন।

যাহা হউক, মনসার ইচ্ছাতেই চাঁদ সদাগর বাঁচিলেন। জলের ঢেউ তাঁহাকে ভাসাইয়া আনিয়া ডাঙ্গায় পৌছাইয়া দিল। তিনি প্রাণে বাঁচিলেন, কিন্তু তাঁহার লক্ষ টাকার বাণিজ্য নষ্ট হইয়া গেল। ছয় ছেলেকে ত আগেই তিনি হারাইয়াছিলেন।

এই ভাবে চাঁদ সদাগর জীবনে বিপদের পর বিপদে পড়িয়াছেন ; একটা বিপদ কাটাইয়া উঠিয়াছেন, অমনি মনসার কোপে আর একটা বিপদের মুখে তাঁহাকে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু চাঁদবেণে পর্ব্বতের মত অটল। মনসার পূজা তিনি কিছুতেই করিবেন না। চাঁদসদাগরের এই পৌরুষ, তাঁহার এই বজ্রাদপি সুকঠোর পণ মনসামঙ্গল কাব্যে অতি উজ্জ্বলভাবেই আঁকা হইয়াছে।

মনসাদেবীর কোপে চাঁদের গৃহ অরণ্যে পরিণত হইয়াছে ; কিন্তু সমস্ত কষ্ট, সকল উৎপীড়নই চাঁদবেণে হাসিমুখে সহ্য করিয়াছেন। পরাজয় বা মনসা-দেবীর নিকট আত্মসমর্পণের কথা তিনি নিমেষের জন্যও মনে স্থান দেন নাই।

চাঁদের বাণিজ্যডিঙ্গা সমুদ্রে ঝড়ে পড়িয়াছে। তিনি যে নৌকায় আরূঢ় তাহা জলমগ্ন হইতে উদ্যত। এই সকল বিপদের মূল মনসাদেবী। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশে একমুঠা ফুল ফেলিয়া দিলেই দেবীর প্রসাদে চাঁদবেণে সকল বিপদ হইতেই উদ্ধার পান। কিন্তু তবু চাঁদবেণে মনসার নিকট আত্মসমর্পণ করেন নাই, বা মনসার পূজা করিয়া দেবীকে তুষ্ট করিবার চেষ্টাও করেন নাই। নিজের পৌরুষের তেজে তিনি হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করিয়া ছিলেন।

সেবারে কালীদহের সাগরে উদ্ধার পাইয়া চাঁদবেণে এখানে-সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে পুনরায় চম্পকনগরে ফিরিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তাঁহার আবার একটি ছেলে হইল। সদাগরের গৃহে শাঁখ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল। ছেলেটির রূপ দেখিয়া পুরবাসীরা সকলে আনন্দে অধীর হইলেন। পুত্রশোকাতুরা সনকা এই পুত্রটি লাভ করিয়া খানিকটা সান্ত্বনা পাইলেন। ছয় পুত্রের শোকে বিহ্বল চাঁদবেণেও পুত্রলাভ করিয়া আনন্দ-

সাগরে ভাসিলেন। বড় আদরে ছেলের নাম রাখা হইল 'লক্ষীন্দর'। লক্ষীন্দর শশিকলার মত বাড়িতে লাগিল। চাঁদবেণের শোকজর্জ্জরিত প্রাণে আনন্দের বান ডাকিয়া গেল।

কিন্তু এত আনন্দের মধ্যেও বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। দৈবজ্ঞ ছেলেটির ভাগ্য গণনা করিয়া বলিল,—বিবাহের রাত্রিতে লক্ষীন্দর সাপের কামড়ে মারা যাইবে।

এবারেও চাঁদবেণের সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা। এখনও তিনি একমুঠা ফুল সাপের দেবী মনসার উদ্দেশে ফেলিয়া দিলে লক্ষীন্দর রক্ষা পায়, যে ছয় পুত্র আর সপ্তডিঙ্গা মধুকর হারাইয়া চাঁদবেণে আজ শোকার্ত্ত, লক্ষীহীন, সেই ছয় পুত্র আর সপ্তডিঙ্গা মধুকরও তিনি ফিরিয়া পান। কিন্তু মনসার নিকট আত্মসমর্পণের কথা চাঁদসদাগর মনেও স্থান দেন না।

তিনি আদেশ দিলেন,—লোহার বাসরঘর তৈয়ারী কর। সেই ঘরে বিবাহের পরে লক্ষীন্দর রাত কাটাইবে। দেখিব, কেমন করিয়া সাপ সেই লোহার ঘরে ঢুকিয়া আমার ছেলেকে দংশন করে!

লোহার ঘর তৈয়ারীর জন্য শত শত কারিগরের ডাক পড়িল। তাহারা লোহার বাসরঘর তৈয়ারী সুরু করিল। সাঁতালী পর্ব্বতের উপরে লোহার বাসর তৈয়ারী হইতে লাগিল। চাঁদসদাগর নিজে এই লোহার ঘর তৈয়ারী তদারক করিতে লাগিলেন। সাঁতালীতে অসংখ্য নেউল ছাড়িয়া দেওয়া হইল। তাহারা লোহার ঘরের চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। সাপ দেখিলেই তাহারা উহাকে ছিন্নভিন্ন করিবে।

চাঁদ অনেক ময়ূর সেখানে ছাড়িলেন, তাহারাও সাপের শত্রু। সাপের বিষকে নিষ্ফল করে এমন অনেক গাছ-গাছড়া সেই সাঁতালী পর্ব্বতে লাগান হইল। সে-সকলের গন্ধে সাপের দল সে তল্লাট ছাড়িয়া পলাইয়া গেল।

মনসাদেবী ব্যাপার দেখিয়া প্রমাদ গণিলেন। এইবার বুঝি তাঁহার সকল জারিজুরি বিফল হইয়া যায়! মানুষ চাঁদবেণে আজ বুঝি দেবী মনসার উপর জয়ী হয়!

প্রমাদ গণিয়া মনসাদেবী সেই লোহার বাসর-নির্ম্মাতা এক কারিগরকে বলিলেন, 'একটি সরু চুল প্রবেশ করিতে পারে, এমন ছোট্ট একটি ছেঁদা লোহার ঘরের গায়ে তোমায় রাখিতে হইবে।' প্রথমটায় সে মনসাদেবীর এই অনুরোধে আপত্তি করিয়াছিল। বলিয়াছিল,"যিনি আমাদের ভাত-কাপড় দিয়াছেন, যাঁহার নুন খাইয়াছি,—তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ তৈয়ারী করিব কি করিয়া?"

তখন মনসাদেবী তাহাকে ভয় দেখাইলেন। মনসাকে কে না ভয় করে? ভয়ে সে রাজি হইল এবং ঐ লোহার বাসরে একটি খুব সরু ছেঁদা রাখিয়া কয়লার গুঁড়া দিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দিল।

ওদিকে দেখিতে দেখিতে লক্ষীন্দর বড় হইল এবং নিছনী গ্রামের বণিকের কন্যা বেহুলার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের রাত্রিতে বেহুলা আর লক্ষীন্দরকে চাঁদসদাগর লোহার বাসরে রাখিয়া দিলেন। তিনি নিজে হিন্তাল গাছের একগাছি মোটা লাঠি লইয়া সারারাত ঐ লোহার বাসরের বাহিরে পাহারা দিবেন বলিয়া প্রস্তুত হইলেন। বেহুলাও দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়াছিলেন। তিনি স্বামীর পাহারায় বাসর ঘরে না ঘুমাইয়া বসিয়া রহিলেন। লক্ষীন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন।

রাত্রি গভীর হইল। চাঁদবেণে ঘরের বাহিরে জাগিয়া পাহারা দিতেছেন। ঘরের ভিতরে সতী-সাধ্বী বেহুলা ঘর আলো করিয়া জাগিয়া বসিয়া আছেন। এমনি সময়ে আকাশের বুকে মেঘগৃহে বসিয়া মনসাদেবী যত রাজ্যের বিষধর সাপকে একে একে স্মরণ করিলেন। মনসার ডাকে দিগ্‌বিদিক হইতে সাপেরা সেখানে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। সে কত রকমের সাপ! কাহারও বা একটা মাথা, কাহারও বা দুইটা বা বহু মাথা, আর তাহাদের গায়ের রংই বা কত রকমের! সব সাপই বিষধর—তক্ষক, বঙ্গদাড়া, কালনাগিনী, এমনি কত রকমের বিষাক্ত সাপ!

মনসাদেবী সাপেদের জিজ্ঞাসা করিলেন—কে লক্ষীন্দরকে দংশন করিতে যাইবে? মনসাদেবীর কথায় সাপেরা মাথা হেঁট করিয়া রহিল। একটা সাপ সবাইকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া মুখ খুলিল। বলিল, "দেবি!

ভয়ে বলব কি নির্ভয়ে বলব ?" দেবী বলিলেন, "নির্ভয়ে বল। ভয়ের কি আছে ?"

তখন সাপটা বলিল, "সাঁতালী পর্ব্বতের উপরে যে সব গাছগাছড়া চাঁদ সদাগর পুঁতিয়াছে তাহার গন্ধ দূর হইতে পাইয়াই আমার হাঁপানি রোগ হইয়াছে। সুতরাং কোন্ ভরসায় লক্ষীন্দরকে কামড়াইতে সেই পাহাড়ের উপরে যাই বলুন ত ?"

এই সাপটিকে মুখ খুলিতে দেখিয়া একে একে সকল সাপের সাহস হইল। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিল, "সাঁতালী পর্ব্বতে গেলে, ময়ূর আর নকুলের হাত হইতে আমরা রক্ষা পাইব কি উপায়ে ?" কেহ বলিল, "চাঁদ সদাগর পাহাড়ের উপর রাজ্যের যত রোজা জড় করিয়াছে। তাহারা ক্রমাগত মন্ত্র পড়িতেছে, আর নানারকম তরুমূল ইতস্ততঃ ছড়াইতেছে। কাহার সাধ্য উহার সম্মুখে যায়—গেলেই যে মৃত্যু অবধারিত।" কেহ বলিল, "সাঁতালী পাহাড়ের বাসরঘরে ছোট একটা ছেঁদা আছে জানি ; সেই পথে ঘরে ঢোকা যাইতে পারে, তাহাও জানি। কিন্তু যে সব সেপাই-শান্ত্রী পাহারা দিতেছে তাহারা এক এক ভরি আফিম খাইয়া চক্ষু লালবর্ণ করিয়াছে। অত আফিম খাইয়া তাহাদের মধ্যে যে বিষ জন্মিয়াছে তাহাতে আমাদের বিষে উহাদের ক্ষতি হওয়া ত দূরের কথা, উহাদের বিষেই আমরা মরিব এমন সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য তাহারা মাথা নীচু করিয়া আমাদের না কামড়াইলেও তাহাদের সঙ্গীনের খোঁচা খাইয়া আমরা যে বাঁচিব, এমন ভরসা ত দেখিতে পাইতেছি না !"

সাপেদের এই সকল কথা শুনিয়া মনসা দেবী বলিলেন, "এ সকল ভীরুর কথা। তোমাদের মধ্যে এমন কোন একটি সাপও কি নাই, যে সাঁতালী পাহাড়ের সকল বিপদ অগ্রাহ্য করিয়া লক্ষীন্দরকে গিয়া কামড়াইয়া আসিতে পারে ?"

মনসার এই কথায় ভীষণ ফণা বিস্তার করিয়া বঙ্করাজ সাপ আগাইয়া আসিয়া মনসাদেবীকে প্রণাম করিল। মনসা তাহাকে আশীর্ব্বাদ

করিলেন। সে মনসার আশীর্ব্বাদ লইয়া সাঁতালী পাহাড়ের দিকে রওনা হইয়া গেল।

ওদিকে বেহুলা তাঁহার স্বামীর পাহারায় রাত্রি জাগিয়া বসিয়াছিলেন তিনি হঠাৎ দেখিলেন যে, লোহার বাসরের এক জায়গা হইতে ঝর ঝর করিয়া গুঁড়া পড়িতেছে। দেখিয়া বেহুলা সজাগ হইয়া বসিলেন। আবার দেখা গেল, তেমনিভাবে লোহার গুঁড়া ঝরিয়া পড়িতেছে। অল্পকালের মধ্যে সেখানে একটা সরু ছেঁদা হইয়া গেল। যে কারিগরেরা লোহার বাসর তৈয়ারী করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে একজন কৌশলে কয়লার গুঁড়া দিয়া বুজাইয়া মনসার অনুরোধে ঐ ছেঁদাটুকু রাখিয়া গিয়াছিল।

সেই ছেঁদার মধ্য দিয়া ভীষণ বঙ্করাজ সাপটি ঘরে ঢুকিল এবং ঢুকিয়াই তাহার কুলার মত ফণাটিকে মেলিয়া ধরিল। চতুরা বেহুলা অমনি করিলেন কি, না একটি সোনার বাটিতে দুধ আর কলা লইয়া সাপের সম্মুখে রাখিলেন। আহারের লোভে বঙ্করাজ মাথা হেঁট করিয়া বাটির মধ্যে তাহার মাথা ঢুকাইল। বেহুলা বাটিটি চাপা দিয়া সাপটাকে বন্দী করিয়া ফেলিলেন।

বঙ্করাজ ফেরে না দেখিয়া মনসাদেবী আর একটি সাপকে পাঠাইলেন। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। তাহারও দশা বঙ্করাজের মতই হইল। বেহুলা তাহাকেও কৌশলে বন্দী করিলেন। রাত্রির তৃতীয় প্রহরে আবার একটি সাপ আসিল। বেহুলা তাহাকেও বন্দী করিলেন।

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া শেষরাত্রে বেহুলার তন্দ্রা আসিতেছিল। তিনি তাঁহার স্বামীর পায়ের তলায় বসিয়া আছেন। তাঁহার চোখ দুইটি ঘুমে ভাঙ্গিয়া আসিতেছে। তবু এক একবার চোখ দুইটি মেলিয়া তিনি সেই দেয়ালের ছেঁদার দিকে চাহিয়া দেখিতেছেন, আর কোন সাপ ঐ ছিদ্রপথে আসিতেছে কি না! কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই আবার ঘুমের ঘোরে তিনি হেলিয়া পড়িতেছেন।

এই সুযোগে মনসা দেবীর তাড়া খাইয়া কালনাগিনী সাপ বিদ্যুৎগতিতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া লক্ষীন্দরের পায়ে কামড়াইল। করুণ বিলাপ করিয়া লক্ষীন্দর মৃত্যুমুখে পতিত হইল, বেহুলার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

তখন পূর্ব্ব আকাশে সূর্য্যদেব উঠিয়াছেন, চাঁদবেণে বাসরের দরজার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। তিনি ভাবিতেছেন, বিপদ কাটিয়া গিয়াছে। সনকা আশীর্ব্বাদের ধান-দূর্ব্বা লইয়া বাসরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি পুত্র ও পুত্রবধূকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আজ ঘরে তুলিবেন। ঘরে তুলিয়া ছয় পুত্রের শোক খানিকটা ভুলিবেন।

কিন্তু ঘরের মধ্যে বেহুলার অস্পষ্ট ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া তাঁহার বুক কাঁপিয়া উঠিল; তিনি এবং তাঁহার সঙ্গিনীরা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাদের শোকের আর অন্ত রহিল না। বড় আশা করিয়া সকলে লক্ষীন্দর ও বেহুলাকে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আশা ব্যর্থ হইল বলিয়া সকলে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এইবার লক্ষীন্দরকে দাহ করিবার পালা। কিন্তু বেহুলা বলিলেন, "সাপের কামড়ে যে মানুষ মারা যায়, লোকে তাহাকে পোড়ায় না; জলে ভাসাইয়া দেয়। আমার স্বামীকেও তোমরা কলার ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দাও।"

বেহুলা যে কথাটা বলিলেন, তাহা লক্ষীন্দরের সকল আত্মীয়-স্বজনের মনে লাগিল। কিন্তু ভেলা যখন তৈয়ারী হইয়া গাঙ্গুরের জলে ভাসিল, লক্ষীন্দরের শবদেহ যখন সেই ভেলায় রাখা হইল, তখন বেহুলাও গিয়া সেই ভেলায় বসিলেন। তিনি বলিলেন, আমি আমার স্বামীর সহিত যাইব। দেখিব কোনো উপায়ে স্বামীকে বাঁচাইতে পারি কি না।

বেহুলার কথা শুনিয়া সকলে 'হায় হায়' করিয়া বলিতে লাগিল, মৃত স্বামীকে বাঁচাইবে, এমন কথা কে কবে শুনিয়াছে! আত্মীয়-স্বজনেরা সকলে আসিয়া বেহুলাকে সাধাসাধি করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"শবদেহ ছাড়িয়া তীরে উঠিয়া এস।" সনকা কাঁদিতে কাঁদিতে বেহুলাকে কত অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "ভেলা ছাড়িয়া উঠিয়া এস মা, আমি তোমার মুখ দেখিয়া লক্ষীন্দরের শোক ভুলিব।" কিন্তু বেহুলা নিশ্চল হইয়া গাঙ্গুরের জলে ভেলায় বসিয়া রহিলেন। শুধু সজল চোখে এই মাত্র বলিলেন,—"তোমরা

সকলে আশীর্ব্বাদ করিও, যেন আমি আমার স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারি।"

আত্মীয়-স্বজন সকলকে চোখের জলে ভাসাইয়া বেহুলা কলার ভেলায় তাঁহার স্বামীর শবদেহ লইয়া ভাসিয়া গেলেন। ভাসিতে ভাসিতে কত দেশে গেলেন—কত দেশ পার হইলেন। তাঁহার স্বামীর শব গলিত হইতেছিল, যে কলার ভেলাখানিতে তিনি স্বামীকে লইয়া ভাসিয়াছিলেন সেই ভেলাখানি পচিতে সুরু করিয়াছিল, উহার বাঁশ একে একে খুলিতে সুরু করিয়াছিল। বেহুলা প্রমাদ গণিয়া একবার মনসা দেবীকে স্মরণ করিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার সেই পুরাতন ভেলা কে যেন অদৃশ্যভাবে আসিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া দিয়া গেল।

এমনি করিয়া প্রায় ছয় মাস কাটিতে চলিল। লক্ষীন্দরের দেহের মাংস গলিয়া খসিয়া পড়িয়া গিয়াছে। শুধু তাঁহার হাড় কয়খানি অবশিষ্ট। বেহুলা তবুও নিরাশ হন নাই, তবুও তিনি তাঁহার স্বামীর সেই কঙ্কাল ছাড়েন নাই। তাঁহার আশা, তিনি তাঁহার স্বামীকে বাঁচাইবার কোন-না-কোন উপায় বাহির করিতে পারিবেনই।

এই ছয় মাসে অনেক বিপদেই বেহুলাকে পড়িতে হইয়াছিল। কত শিয়াল, কত বাঘ লক্ষীন্দরকে খাইবার জন্য আগাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু বেহুলার জন্য তাহারা কেহই লক্ষীন্দরের শবদেহের কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই।

কলার ভেলায় করিয়া নানান্ দেশে ঘুরিতে ঘুরিতে বেহুলা তাঁহার ভাগ্যবলে স্বর্গের এক ধোপানীর দেখা পাইল। তাহার নাম নেতা। এই নেতা ধোপানীর দেখা পাইয়া বেহুলা তাহার পদতলে গিয়া পড়িলেন। নেতা আদর করিয়া বেহুলার চোখের জল মুছাইয়া দিল। তাঁহাকে অনেক স্নেহমধুর কথা বলিল। নেতা যেন বেহুলার কত দিনের পরিচিত, কত অন্তরঙ্গ! তাহার স্নেহ পাইয়া বেহুলার অশ্রু জোয়ারের জলের মত বহিল। নেতা বেহুলার চোখের জল দেখিয়া তাঁহার দুঃখের কাহিনী জানিতে চাহিল।

সমস্ত কথা শুনিয়া সে বেহুলাকে স্বর্গে দেবসভায় লইয়া যাইতে চাহিল বলিল, "স্বামী বাঁচাইবে ত আমার সঙ্গে স্বর্গে চল। মহেশ্বর তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

নেতার সহিত স্বামীর কঙ্কাল লইয়া বেহুলা স্বর্গে গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি দেবসভায় উপস্থিত হইলেন।

বেহুলা নৃত্যগীতে খুব নিপুণা ছিলেন। দেবতারাও সে কথা জানিতেন। সুতরাং দেবসভায় উপস্থিত হইতেই দেবতারা বলিলেন, "বেহুলা, আমরা তোমার স্বামীভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে তোমার নৃত্যে তৃপ্ত কর,—সফল হইলে তোমার স্বামীর প্রাণ আমরা দান করিব।"

দেবতাদিগের এই নিদারুণ আজ্ঞায় বেহুলা বিষম ফাঁপরে পড়িলেন। যেখানে উর্ব্বশী, মেনকা, তিলোত্তমা, রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণ নৃত্য করিয়া দেবতাদিগকে তৃপ্ত করেন, সেখানে মানবী বেহুলা আর কিরূপে নৃত্য করিয়া তাঁহাদিগকে আনন্দ দিবেন? এই চিন্তায় তিনি অধীর হইলেন।

যাহা হউক, বেহুলা নৃত্য করিলেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া দেবতারা পরম সন্তুষ্ট হইলেন, এবং শিব তখন মনসাকে বলিলেন, "লক্ষীন্দরকে বাঁচাইয়া দাও।" উত্তরে মনসা বলিলেন, "কিন্তু মর্ত্ত্যে আমার পূজা প্রচারের কি হইবে? চাঁদ সদাগর আমার পূজা না করিলে মর্ত্ত্যে যে আমার পূজা প্রচার হয় না!"

মহাদেব বলিলেন, "আচ্ছা সে ব্যবস্থা আমি করিতেছি। তুমি লক্ষীন্দরকে বাঁচাইয়া দাও।"

মনসা লক্ষীন্দরকে বাঁচাইয়া দিয়া বেহুলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, আমি তোমার তপস্যায় খুশী হইয়াছি। তোমার যদি আর কিছু প্রার্থনা থাকে ত' বল, আমি তাহা পূর্ণ করিব।" বেহুলা তখন চাঁদ সদাগরের অপর ছয় পুত্রের জীবন ভিক্ষা করিলেন। তাহারাও মনসার কোপে সর্পদংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। মনসার অনুগ্রহে চাঁদ সদাগরের সেই ছয় পুত্রও প্রাণ ফিরিয়া পাইল। চাঁদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর মনসা দেবীই নষ্ট করিয়াছিলেন। উহার স্থলে মনসা চৌদ্দ ডিঙ্গা আনিয়া বেহুলাকে দিয়া বলিলেন,—"তোমার

শ্বশুরকে বলিবে, তাঁহার মৃত পুত্র, নষ্ট সম্পত্তি সবই আমি ফিরাইয়া দিলাম। তিনি যেন আমার পূজা করেন। পূজা না করিলে, যাহা কিছু ফিরাইয়া দিলাম সে সবই কিন্তু আবার হারাইতে হইবে!"

মনসা দেবীর এই কথায় বেহুলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু মহাদেব বেহুলাকে আশ্বাস দিলেন। বেহুলা শান্ত হইলেন।

বেহুলা তাঁহার স্বামীর, ভাসুরদিগের জীবন ভিক্ষা করিয়া চম্পকনগরে ফিরিলেন। চাঁদ সদাগর সাত ডিঙ্গার জায়গায় চৌদ্দ ডিঙ্গা পাইলেন। রাজ্যে আনন্দের বান ডাকিল। বেহুলা তখন তাঁহার শ্বশুর চাঁদবেণেকে মনসার সহিত বাদ সাধিতে নিষেধ করিলেন।

এতদিন চাঁদবেণে কাহারও কথায় মনসার পূজা করেন নাই। পুত্রশোকে অধীরা সনকার ক্রন্দনে, অথবা নিজে উপরি উপরি বিপদে পড়িয়াও তিনি মনসার নিকটে নতিস্বীকার করার কথা মনের কোণেও স্থান দেন নাই। কিন্তু এখন পুত্রবধূর অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পুত্রবধূর মুখ চাহিয়া তিনি মনসার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। রূপে গুণে অতুলনীয়া পুত্রবধূকে কষ্ট দিতে পারেন নাই বলিয়াই চাঁদবেণে মনসার পূজা করিলেন। পৃথিবীতে মনসার পূজা প্রচারিত হইল।

মনসাদেবীর কোপে কি ভাবে মানুষের জীবনে পর পর এক একটি করিয়া বিপদ আসিয়া থাকে, মনসামঙ্গলে তাহাই দেখান হইয়াছে। কিন্তু মনসার পূজা করিলে, তাঁহার অনুগ্রহে সাপের ভয় কাটিয়া যায়, বিপদের জাল হইতে মুক্ত হইয়া মানুষ নিশ্চিন্তভাবে সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারে।

এই চাঁদসদাগর আর বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী লইয়া বাংলা সাহিত্যে যে সব মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস, নারায়ণদেব, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রভৃতি কবির লেখা মনসামঙ্গল কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামায়ণ রচয়িতা মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর কথা পূর্ব্বেই আমরা পাইয়াছি। এই চন্দ্রাবতীর পিতা দ্বিজ বংশীদাস ক্ষমতাশালী

কবি ছিলেন। ইনিও একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। কাব্যখানি তিনি নিজে গান করিতেন। তাঁহার মনসামঙ্গল গান এত মধুর, এবং এত করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী যে, কেনারাম নামে সেকালের এক দস্যু তাঁহার মনসামঙ্গল গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিল।

শুধু বংশীদাসের মনসামঙ্গল নহে, অন্যান্য মনসামঙ্গল কাব্যগুলিরও পালাগান হইত। এখনও বাংলাদেশের অনেক জায়গায় মনসামঙ্গলের গান হইয়া থাকে।

চৈতন্য-পূর্ব্বযুগে মনসামঙ্গলের মত চণ্ডীর মহিমা প্রচার করার জন্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল তখন পর্য্যন্ত ব্রতকথার আকারে ছোট ছিল। বৃহৎ কাব্যে সেগুলি তখনও পরিণত হয় নাই। চৈতন্য-পূর্ব্বযুগে চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা কোনো ক্ষমতাশালী কবিও আবির্ভূত হন নাই। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ক্ষমতাশালী কবি হইতেছেন—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী এবং মাধবাচার্য্য। ইঁহারা উভয়েই পরচৈতন্য যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের কথা পরে বলিব।

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ

নবদ্বীপ। নবদ্বীপের ধার দিয়া ভাগীরথী নদী তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। কত লোক নদীতে স্নান করিতেছে, কেহ বা কোশাকুশি লইয়া গঙ্গার ধারে মাটির শিব তৈয়ারী করিয়া চোখ বুজিয়া বসিয়া একমনে শিবপূজা করিতেছে। কিন্তু একটি দুরন্ত ছেলের দুরন্তপনায় স্নানার্থী আর পূজার্থীরা জ্বালাতন হইয়া উঠিয়াছে। ছেলেটি কাহারও শুকনা জামা-কাপড় ভিজাইয়া দিয়া পলাইয়া যাইতেছে। কাহারও বা কাপড় লুকাইয়া রাখিতেছে। স্নান করিয়া উঠিয়া আসিয়া স্নানার্থীরা তাহাদের কাপড়-চোপড় ভিজা দেখিয়া অথবা কাপড়-চোপড় খুঁজিয়া না পাইয়া রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিতেছে। ছেলেটি কখনও বা ধ্যানরত পূজার্থীর শিবমূর্ত্তি আর কোশাকুশি লইয়া পলাইতেছে।

তারপর চোখ মেলিয়া শিবমূর্ত্তি আর কোশাকুশি সরিয়া যাইতে দেখিয়া পূজার্থীর চক্ষু স্থির হইয়া যাইতেছে। ছেলেটির এমনিতর দুরন্তপনার অন্ত ছিল না। সে কাহারও গায়ের চাদর হঠাৎ টানিয়া লইয়া পলাইত, কাহারও পূজার ফুল ফেলিয়া দিত। মেয়েরা নদীতে স্নান করিতে নামিলে তাহাদের চুলে ওকড়া ফলের বিচি ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিত। ওকড়া ফলের বিচিতে ভীষণ কাঁটা আর শুঁয়া। উহা চুলে পড়িলেই চুলের সহিত উহা জড়াইয়া যাইত। আর উহা ছাড়াইতে গিয়া মেয়েদের বেশ কয়েক-গাছি চুল ছিঁড়িয়া যাইত। ফলে রাগে তাহারা গরগর করিতে করিতে বাড়ীতে ফিরিত। মাঝে মাঝে এই দুরন্ত বালক ধরা পড়িত। তখন কাঁদিয়া-কাটিয়া সে সকলের কাছে ক্ষমা চাহিত—বলিত, "আর কখনও এমন কাজ আমি করিব না।" কিন্তু পরদিনই আবার সে দুরন্তপনা করিয়া সকলকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত।

বাড়ীতে এবং পাড়ার মধ্যেও বালকটির দুরন্তপনার অন্ত ছিল না। সে লুকাইয়া কাহারও ঘরের দুধ, কাহারও ঘরের ভাত খাইত। যাহার ঘরে কিছু পাইত না, তাহার ঘরের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া সে পলায়ন করিত। কাহারও বাগানের পাকা কলা সে চুরি করিত, কাহারও ঘরের ঘুমন্ত শিশুকে জাগাইয়া কাঁদাইয়া দিয়া পলায়ন করিত। তারপর গৃহস্থেরা যখন ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড অবস্থায় দেখিত, অথবা যখন দেখিত যে ভাতের হাঁড়ি খালি কিংবা হাঁড়িটি ভাঙ্গা—তখন তাহারা ভাবিত যে, উহা বোধহয় ভূতপ্রেত দানব-দৈত্যের কাজ! সুতরাং বাড়ীতে বাড়ীতে তখন ভূতশান্তির জন্য শান্তি-স্বস্ত্যয়নের ধূম পড়িয়া যাইত।

এই যে দুরন্ত বালক—ইঁহার নাম শ্রীচৈতন্যদেব। এই দুরন্ত ছেলে একদিন মহাপণ্ডিত হইয়াছিলেন, একদিন ইঁহার চরিত্র হইয়াছিল বড় মধুর। বয়সে অনেক বড় এবং অশেষ খ্যাতিমান্ বহু পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার এই নিমাই পণ্ডিত (শ্রীচৈতন্যদেব এই নামেই নবদ্বীপে পরিচিত ছিলেন) চূর্ণ করিয়াছিলেন।

একবার এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নানান্ দেশের পণ্ডিতকে তাঁহার পাণ্ডিত্যের দ্বারা হারাইয়া শেষে নবদ্বীপের পণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধ করিতে আসেন। নবদ্বীপের কোনো পণ্ডিত এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে রত হইতে ভরসা পাইলেন না। তাঁহারা ইঁহাকে পাঠাইয়া দিলেন নিমাইয়ের কাছে। কারণ নিমাইয়ের পাণ্ডিত্য তখন সারা নবদ্বীপে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের কথা শুনিয়া এবং তাঁহার সহিত তাঁহাকে তর্ক করিতে হইবে জানিয়া নিমাইয়ের খোঁজে ঘুরিতে ঘুরিতে গিয়া হাজির হইলেন গঙ্গার ধারে। নিমাই পণ্ডিত সেখানে তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া শাস্ত্র আলোচনা করিতেছিলেন। সেইখানে গিয়া ঐ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া নিমাই পণ্ডিতকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"পরিচয় দাও দেখি, তুমি কত বড় পণ্ডিত!"

নিমাই মৃদু হাসিয়া ঐ পণ্ডিতের সঙ্গে আলোচনায় রত হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে একেবারে হারাইয়া দিলেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতে নিমাইয়ের সহিত আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া ঐ অহঙ্কারী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কোথায় যে পলাইয়া গেলেন আর কেহ তাঁহার খোঁজ পাইলেন না।

যে পণ্ডিত অন্যান্য দেশে জয়ী হইয়া বাংলাতেও জয়ী হইয়া দিগ্বিজয়ী রাজার মত দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত হইবার আশায় বাংলায় আসিয়াছিলেন তিনি যুবক নিমাইয়ের কাছে হারিয়া যাওয়ায় বাংলার মান রহিল।

এই নিমাই পণ্ডিত সেদিন শুধু বাংলার মানই রাখেন নাই। তিনি বাংলার ধর্ম্মজীবনকে উন্নত করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের সময়ে এদেশের ধর্ম্মে ভক্তিহীনতা দেখা দিয়াছিল। লোকেরা অনেক লৌকিক দেবদেবীর পূজা করিত—যেমন, মনসা, চণ্ডী প্রভৃতি। কিন্তু সেই সকল পূজায় অর্থহীন অনুষ্ঠান আর আড়ম্বরই ছিল বেশী। ভক্তির সহিত দেবতাকে ডাকিতে সকলেই ভুলিয়াছিল। চৈতন্যদেব ভক্তিহীন এই দেশে ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। লোকদিগকে ভক্তির মহিমা তিনিই বুঝিতে শিখাইয়াছিলেন।

পদাবলী সাহিত্য

শ্রীচৈতন্যদেব শুধু যে বাংলায় ভক্তির স্রোত বহাইয়া এদেশের লোকদিগকে কৃষ্ণভক্তিতে মাতাইয়া তুলিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যের বিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যযুগ বিশেষভাবেই স্মরণীয়। কারণ, তাঁহার আবির্ভাবের আগে বাংলা সাহিত্য যেন একটা বাঁধা খাত ধরিয়া চলিয়াছিল। তাহাতে না ছিল বৈচিত্র্য, না ছিল তেমন সমৃদ্ধি। তখন বাংলাদেশের কবিরা শুধুমাত্র মঙ্গলকাব্য অথবা অনুবাদকাব্যই রচনা করিতেছিলেন। এই দুই শ্রেণীর কাব্যরচনা ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে যে কবিপ্রতিভার পরিচয় দেওয়া যাইতে পারে, এ ধারণা সে যুগের কবিদের হয় নাই বলিলেই হয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরই বাংলা পদাবলী সাহিত্য নূতন প্রাণ পাইল।

চৈতন্য পরবর্ত্তী যুগের এই পদাবলী সাহিত্যে একদিকে কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে, অন্যদিকে চৈতন্যলীলা বর্ণিত হইয়াছে। আবার কতকগুলিতে ভগবানের স্তবস্তুতি, নামমাহাত্ম্যও বর্ণিত হইয়াছে। যে সকল পদে চৈতন্যলীলা বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা 'গৌরচন্দ্রিকার পদ' নামে বিখ্যাত। কৃষ্ণলীলাত্মক পদাবলী কীর্ত্তন করা হইত—এখনও খোল-করতাল সহযোগে কৃষ্ণলীলার পদসকল কীর্ত্তন করা হয়। সেই কৃষ্ণলীলা গাহিবার আগে 'গৌরচন্দ্রিকা' গাহিয়া শ্রোতাদের মন ভক্তিতে অভিষিক্ত করিয়া লওয়া হইত, বা এখনও হইয়া থাকে। চৈতন্যদেব ছিলেন ভক্তিভাবের প্রতিমূর্ত্তি, তাই তাঁহার চরিতের গানগুলিও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ।

চৈতন্য-পূর্ব্বযুগে রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়া পদাবলী সাহিত্য রচিত হইয়াছিল। তাহাতে ভাব ভাষা ও ছন্দের কারিগরী ছিল সত্য, কিন্তু পরচৈতন্যযুগের রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলীর সহিত পূর্ব্বচৈতন্যযুগের পদাবলীর তুলনাই হয় না। ইহার কারণও ছিল। কারণ, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকালের বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে কৃষ্ণভক্তির যে অপরূপ বিকাশ দেখিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা তাঁহাদের

কবিতায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমের ছবি দেখিয়া রাধার কৃষ্ণভক্তির ছবি আঁকিয়াছিলেন। তাই চৈতন্যদেবের কৃষ্ণভক্তি যে কত গভীর ছিল, তাহা বুঝিয়া তবে পদাবলী সাহিত্যকে বুঝিতে হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরে কৃষ্ণভক্তির সঞ্চার হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রেমে অধীর হইয়া তিনি কীর্ত্তনে মাতিতেছেন, কখনও ভক্তিতে তন্ময় হইয়া জ্ঞান হারাইতেছেন। ইহা ভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণের দেহের রঙের সহিত বা তাঁহার রূপের সহিত পৃথিবীর যাহা কিছুর এতটুকু সাদৃশ্য দেখিতেছেন, তন্ময় হইয়া তাহাই তিনি নিরীক্ষণ করিতেছেন, অথবা ভাবাবেগে পাগল হইয়া যাইতেছেন।

মেঘের নীল রং, ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠের নীলিমা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গকান্তির কথা। তমাল তরুর ঘন-নীল নিবিড়তা তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণের রূপমাধুরী জাগাইয়া দিয়াছে। তাই উহাকেই কৃষ্ণ মনে করিয়া তিনি গিয়া উহাকে ভাবাবেশে আলিঙ্গন করিয়াছেন। ঈশ্বরপ্রেমে কতখানি তন্ময় হইলে তবেই মানুষ এমনিতর আচরণ করিতে পারে!

বাংলা পদাবলী সাহিত্যে রাধিকার যে বর্ণনা কবিরা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আমরা কৃষ্ণের জন্য রাধিকার যে আকুলতা দেখিতে পাই, তাহা যেন শ্রীচৈতন্যদেবের আচরণের প্রতিচ্ছবি। রাধিকা শ্রীচৈতন্যদেবের মতই—

এক দীঠ করি ময়ূর-ময়ূরী
কণ্ঠ করে নিরীখনে। —চণ্ডীদাস

একদৃষ্টিতে ময়ূর-ময়ূরীর কণ্ঠ নিরীক্ষণ করিয়াছেন। অপলক চোখে মেঘের পানে চাহিয়া সময় কাটাইয়া দিয়াছেন। কারণ ঘন মেঘের নীল রং দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের দেহের নীল নবঘন কান্তির কথা তাঁহার মনে পড়িয়া গিয়াছে—

সদাই ধেয়ানে চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নের তারা।

রাধিকাও চৈতন্যদেবের মত তমাল তরুকে কৃষ্ণ কল্পনা করিয়া আলিঙ্গন করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম শুনিবামাত্র তিনি বক্তার পদে লুটাইয়া পড়িয়াছেন—

যে করে কানুর নাম ধরে তার পায়।
পায়ে ধরি কাঁদে সে চিকুর গড়ি যায়॥—বৈষ্ণব পদাবলী

চৈতন্যদেবও এইরূপ কতবার কৃষ্ণনাম শুনিয়া বক্তার পায়ে ধরিয়াছেন, কৃষ্ণনাম শুনিয়া আনন্দে তন্ময় হইয়া গিয়াছেন—

কৃষ্ণ অনুরাগে সদা আকুল হৃদয়।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম অশ্রুধারা বয়॥
প্রাণকৃষ্ণ বলি যদি দৈবে কেহ ডাকে।
ধেয়ে গিয়ে আলিঙ্গন করেন তাহাকে॥
চৈতন্যদেবের জীবনীগ্রন্থ—গোবিন্দদাসের কড়চা

কল্পনার সাহায্যে যে বর্ণনা করা যায়, তাহার চেয়ে একটা প্রত্যক্ষ অথবা সত্যকারের জীবন্ত ছবি দেখিয়া যে বর্ণনা করা হয়, তাহার স্পষ্টতা যে বেশী হইবে ইহা স্বাভাবিক! চৈতন্যদেবের ভক্তিময় জীবন দেখিয়া পরচৈতন্য-যুগের বৈষ্ণব পদকর্ত্তারা রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন বলিয়া, এই যুগের পদাবলীসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা খুব স্পষ্ট এবং উজ্জ্বল, মধুর এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হইয়াছে।

ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে একটা অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার ভাব বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের বিশেষত্ব। বৈষ্ণব পদাবলীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আত্মার আত্মীয়রূপে কল্পিত—সেখানে দেবতা ও ভক্তের মধ্যে কোন দূরত্ব নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে এই জিনিসটি পরচৈতন্য যুগের পদকর্ত্তারা দেখিয়াছিলেন,—তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিভরে দূর হইতে দেবতার অর্চ্চনা করেন নাই, ভক্তির আবেগে তিনি দেবতার সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন। পদাবলীসাহিত্যের রাধিকার মধ্যে কৃষ্ণের সহিত

এইরকম একাত্মতার একটা ভাব বৈষ্ণব কবিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে দেখিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যে দেখা যায় যে, দেবতারা পূজা পাইবার জন্য অত্যন্ত লালায়িত—একরকম জোর করিয়াই তাঁহারা তাঁহাদের মহিমা লোককে বুঝাইয়াছেন এবং তারপর লোকের কাছ হইতে পূজা আদায় করিয়াছেন। তাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে ভক্তে ও দেবতায় একটা দূরত্ব রহিয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব-কবিতায় চৈতন্যদেবের জীবনের আদর্শে দেবতা ও মানবে একটা একত্ব ঘটিল। ইহাতে বাংলা সাহিত্যের যেমন সমৃদ্ধি হইল, তেমনি অন্যদিকে কল্পনা ও কবিত্ব-প্রকাশের এক নূতন পথ খুলিয়া গেল।

জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, রায়শেখর, শশিশেখর, বলরামদাস, লোচনদাস, নরোত্তমদাস, নরহরিদাস, রাধামোহন ঠাকুর প্রভৃতি কত কবি যে পদাবলী রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহার আর ইয়ত্তা নাই। চণ্ডীদাসের কথা ত আগেই বলিয়াছি। পদাবলী সাহিত্যের তিনি আদি কবি—অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ কবি। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের এমনি মহিমা ছিল যে, তাহা লক্ষ্য করিয়া চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ও চৈতন্যদেবের পরবর্ত্তীকালের অনেক মুসলমান কবিও এই রাধাকৃষ্ণলীলা লইয়া পদ রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে খ্যাতিমান হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে নাম করিতে হয়—নসির মামুদ, সালবেগ, সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রভৃতির।

এই সব বৈষ্ণব কবিদের ভাব লইয়া পরবর্ত্তী যুগেও অসংখ্য কবির কাব্য রচিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথও তাঁহার 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে বৈষ্ণব কবিতার বিশিষ্ট ভাষা ও ভাব ব্যবহার করিয়াছিলেন। এখনও বৈষ্ণব কবিদের পদ বাংলা দেশের সর্ব্বত্রই কীর্ত্তন করা হয়। এই কীর্ত্তন গানের সুর এবং গাহিবার রীতি বাংলার নিজস্ব। বাংলার মাটিতে ইহার উদ্ভব হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যদেবই এই কীর্ত্তন গানের প্রবর্ত্তন করেন। রাধাকৃষ্ণলীলা লইয়া এমন প্রাণমাতান গান করিতে এক বাঙ্গালী ছাড়া ভারতের আর কোন প্রদেশের লোকেরা জানে না।

জীবনীসাহিত্য

শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে আমাদের সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণের লীলা লইয়া যে কবিতা রচিত হইল, তাহার তুলনা মেলে না। তা ছাড়াও, তাঁহার আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে কাব্যরচনার একটি নূতন ধারার প্রবর্ত্তন হইল। ইহাতেও বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য বাড়িল।

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিত রচনার সূত্রপাত হয়। চৈতন্যদেবের অলৌকিক চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব লইয়া বাংলা সাহিত্যের অনেক কবি জীবনী-কাব্য রচনা করিলেন। মানুষের জীবনকাহিনী অবলম্বন করিয়া কাব্যরচনা করা বাংলা সাহিত্যে সেই প্রথম।

শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনী লইয়া যে সকল কাব্য বাংলাদেশে রচিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে,—গোবিন্দদাসের কড়চা, বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, লোচনদাসের চৈতন্য-মঙ্গল আর কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত। এক একজন কবি এক এক ভাবে চৈতন্যদেবের জীবনের মাহাত্ম্য দেখিয়াছেন, এবং নিজের সেই বিশিষ্ট দেখার ভঙ্গীতে এই অসামান্য পুরুষের চরিত্রমাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কাহারও বর্ণনা বেশ বাস্তব হইয়াছে, কাহারও বর্ণনায় কল্পনা ও কবিত্বের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। কাহারও বর্ণনায় শ্রীচৈতন্যদেবের লীলার মধ্যে দেবতার লীলা প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা আছে, কাহারও বর্ণনায় চৈতন্যদেবের লীলার অলৌকিকত্ব বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণব সাধনা ও বৈষ্ণব দর্শনকে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সকল জীবনকাহিনীর মধ্য হইতে সেই যুগের বাংলার সমাজ-জীবনের অনেক কথাও জানা যায়।

শুধু চৈতন্যদেবের জীবনকাহিনী লইয়াই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিত রচিত হয় নাই। চৈতন্যদেবের শিষ্য ও সঙ্গিগণের জীবন-কাহিনী লইয়াও কয়েকখানি জীবনীকাব্য রচিত হইয়াছিল। ফলে বাংলা সাহিত্য গতানুগতিকতামুক্ত হইল—বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন

অধ্যায়ের স্থচনা হইল। এতদিন দেবদেবীর দৈবী মহিমাই বাংলা সাহিত্যের কবিদিগের বর্ণনার বিষয় ছিল। এখন হইতে মানুষী মহিমাও সাহিত্যসৃষ্টির উপকরণ হইল।

পরচৈতন্যযুগের প্রধান উল্লেখযোগ্য সাহিত্য হইতেছে,—পদাবলী সাহিত্য এবং জীবনী কাব্য। ইহা ছাড়া, এই যুগে অনুবাদকাব্য এবং মঙ্গলকাব্যও রচিত হইয়াছিল।

মহাভারত

মধ্যযুগের অনুবাদকাব্যের মধ্যে মহাভারতের অনুবাদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীর জীবনের উপরে যে দুইখানি কাব্য সব চেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা হইতেছে—রামায়ণ ও মহাভারত। এই দুইখানি কাব্যই বাঙ্গালীর জীবনকে গড়িয়াছে, বাঙ্গালীকে তাহার সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দিয়াছে। এই দুইখানি কাব্যের গল্প-কাহিনী নীতি-উপদেশ বাঙ্গালীর— শুধু বাঙ্গালীর কেন, সারা ভারতের—লোকশিক্ষার প্রধান সম্বল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পরবর্ত্তীকাল এই মহাভারত রচনার জন্য স্মরণীয়। বাংলাদেশে তখন মুসলমান শাসন। নৃপতি হুসেন শাহ তখন বাংলার শাসন-কর্ত্তা। তাঁহার এক সেনাপতি ছিলেন, তাঁহার নাম পরাগল খাঁ। পরাগল খাঁ শক্তিশালী যোদ্ধা। তিনি একবার চট্টগ্রাম জয় করিয়া অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিলেন। হুসেন শাহ তাঁহার সেনাপতির বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাকে চট্টগ্রাম অঞ্চলটি তাঁহার বীরত্বের পুরস্কার হিসাবে দান করিলেন। পরাগল খাঁ চট্টগ্রামে স্বাধীন রাজার মত বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজসভা নিত্য-নিয়মিত বসিত। জ্ঞানী ও গুণীর সমাবেশে তাঁহার রাজসভা গমগম করিত।

ইঁহার দরবারে কবীন্দ্র পরমেশ্বর নামে এক কবি ছিলেন। পরাগল খাঁর সাধ হইল, তিনি মহাভারতের কাহিনী শুনিবেন। কবীন্দ্রকে তিনি অনুরোধ

করিলেন—সংস্কৃত মহাভারত বাংলায় অনুবাদ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে। কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারত অনুবাদ করিলেন। পরাগল খাঁ মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া এমন মোহিত হইলেন যে, প্রতিদিন তাঁহার আদেশে ঐ মহাভারত-কথা তাঁহার দরবারে পড়া হইত।

পরাগল খাঁর ছেলে ছুটি খাঁ। তিনিও তাঁহার পিতার মত বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। তিনি শ্রীকর নন্দী নামে এক কবিকে দিয়া মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের অনুবাদ করাইয়াছিলেন। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বের কাহিনী তাঁহার বড় ভাল লাগিত। তাই সমস্ত মহাভারত-খানি অনুবাদ না করাইয়া, তিনি শুধু ঐ অংশটি অনুবাদ করাইয়া উহা শুনিতেন।

তবে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম দাস। কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারত কাশীরাম দাসের মহাভারতের চেয়ে প্রাচীন। কিন্তু মহাভারতের কবি হিসাবে কাশীরাম দাসের যশ সবচেয়ে বেশী।

প্রায় তিনশত বৎসর আগে কাশীরাম দাস বর্দ্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস যেমন তাঁহার রামায়ণে মূল ছাড়িয়া অনেক জায়গায় নিজের মনোমত করিয়া রচনা করিয়াছেন, কাশীরাম দাসও সেইরূপ ব্যাস-দেবের মূল মহাভারত ছাড়িয়া নিজের পছন্দসই অনেক নূতন জিনিস তাঁহার কাব্যের মধ্যে বসাইয়াছেন। ইহাতেই আমরা তাঁহার কবিত্ব শক্তির পরিচয় পাইয়া থাকি।

কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

এ কথার মধ্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নাই। সত্যই কাশীরাম দাস মহাভারতের অমৃত-সমান কাহিনী বাংলাদেশে প্রচার করিয়া বাঙ্গালীর অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। ভগীরথ যেমন মহাদেবের জটার মধ্য হইতে গঙ্গাকে মুক্ত করিয়া তাঁহার ধারা জগতে প্রবাহিত করিয়া পৃথিবীকে উর্ব্বরা

শস্যশ্যামলা করিয়াছিলেন, কাশীরাম দাসও তেমনি সেই ভগীরথের মত সংস্কৃত মহাভারতের ভাবধারা বাঙ্গালীর মনের গোচর করিয়া বাঙ্গালীর চিত্তকে সরস, উন্নত এবং সমৃদ্ধিশালী করিয়া গিয়াছেন।

যে মহাভারতের অমৃত-সমান কাহিনী শুনিয়া বীরকুলতিলক শিবাজীর চরিত্র গঠিত হইয়াছিল, কাশীরাম দাস সেই মহাভারতের কাহিনী বাংলা-দেশে প্রচার করিয়াছেন। এই কাশীদাসী মহাভারতই শত সহস্র বাঙ্গালীর চরিত্র গঠন করিয়াছে, কত কবির কাব্য-নাটক রচনার উপকরণ জোগাইয়াছে।

চৈতন্য-পরবর্ত্তী যুগে, অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের এই মধ্য যুগে বাংলার কবিদের প্রতিভা মঙ্গলকাব্য রচনায়ও নিয়োজিত হইয়াছিল। মনসামঙ্গলের কাহিনী আগেই বলা হইয়াছে,—এই কাব্যের কয়েকজন বিখ্যাত কবির নামও বলা হইয়াছে। এইবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিদের কথা বলিব।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য

মনসামঙ্গল কাব্যে যেমন মনসার মহিমার কথা বলা হইয়াছে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তেমনই চণ্ডীর মহিমার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। অবশ্য দেবী-মহিমা বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা পৃথিবীর নরনারীর চরিত্রও অঙ্কন করিয়াছেন। মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথাও চণ্ডীর চরিত্রের পাশে বেশ স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবী-মহিমা বুঝাইবার জন্য পর পর দুইটি গল্প বলা হইয়াছে। একটি গল্প ব্যাধ কালকেতুর, আর একটি গল্প ধনপতি সদাগরের। ব্যাধ কালকেতুর গল্পে দেখান হইয়াছে যে, সে প্রথম জীবনে বড়ই দরিদ্র ছিল। কিন্তু চণ্ডীর কৃপায় তাহার অতুল ঐশ্বর্য্য, অগাধ ধন-সম্পদ লাভ হইয়াছিল। আর ধনপতি সদাগরের গল্পে দেখান হইয়াছে যে, সদাগর

প্রথমে চণ্ডীর ভক্ত ছিলেন না, বা চণ্ডীর পূজা করিতেন না। তাঁহার এক স্ত্রী চণ্ডীর পূজার জন্য ঘট পাতিয়াছিল,—অবজ্ঞাভরে তিনি সেই ঘটে লাথি মারিয়াছিলেন। ফলে তাঁহার উপর দেবীর আক্রোশ হইয়াছিল। তারপর সদাগর যখন বাণিজ্য-যাত্রা করিয়া সাগরে পৌছিলেন, তখন চণ্ডীর মায়ায় সাগরে ভীষণ ঝড় উঠিয়াছিল। একে একে তাঁহার ছয়টি ডিঙ্গা ডুবিয়াছিল। তিনি কোনরকমে বাঁচিয়া সিংহলে গিয়া পৌছান, কিন্তু সিংহলরাজের কোপে পড়িয়া বন্দী হন। ইহাও চণ্ডীর মায়ায় হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত চণ্ডীর পূজা করার ফলে ধনসম্পত্তি-সহ সদাগর মুক্তিলাভ করেন এবং তাঁহার সমস্ত নষ্ট সম্পত্তি ফিরিয়া পান।

গল্প দুইটি সংক্ষেপে এই :—কালকেতু ব্যাধের ছেলে। ছেলেবেলায় তাহার চেহারা ভারী সুন্দর ছিল।

নাক, মুখ, চক্ষু কান, কুন্দে যেন নিরমাণ,
দুই বাহু লোহার শাবল ;
রূপ গুণ শীল বাড়া যেন সে শালের কোঁড়া,
জিনি শ্যাম চামর কুন্তল।

ব্যাধের ছেলে বলিয়া তাহার সাজ-সজ্জাও ছিল ব্যাধের ছেলের মতই। তাহার গলায় জালের কাঁঠি, হাতে লোহার শিকল, বুকে বাঘনখের মালা, গায়ে রাঙ্গা ধূলি, মাথার বড় বড় চুলগুলি জালের দড়ি দিয়া বাঁধা।

ছেলেবেলা হইতে তাহার দেহে ছিল অসীম শক্তি। সে বনের ভালুক আর বানর ধরিয়া অবলীলায় খেলা করিত। ছেলেদের দলের সেই ছিল সর্দ্দার। সে এত জোরে দৌড়াইতে পারিত যে, ছুটিয়াই সে খরগোস ধরিতে পারিত, পাখীগুলিকে সে বাঁটুল দিয়া বিঁধিয়া শিকার করিত। তারপর শিকার শেষ হইয়া গেলে, সন্ধ্যাবেলায় বীর কালকেতু শিকারের ভার কাঁধে লইয়া রোজ ঘরে ফিরিত।

এই কালকেতু ক্রমশঃ তাহার শৈশব অতিক্রম করিয়া কৈশোরে পড়িল। তখনও তাহার তেজ আর সাহস অসামান্য। তখনও সে রোজ বনে গিয়া

শিকার করিত। বাঘ দেখিলে সে উহার লেজ মোচড়াইয়া মারিত। সিংহকে সে মারিত না, কারণ সিংহ যে দুর্গার বাহন। কিন্তু দুষ্ট সিংহকে দরকার হইলে সে ধনুকের বাড়ি দিয়া এমন শিক্ষা দিয়া দিত যে, সেই আঘাত খাইয়া পশুরাজের ছাতি তৃষ্ণায় ফাটিয়া যাইত। তখন সেই সিংহ নিকটের কোন জলাশয় হইতে জল পান করিয়া তবে সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ হইত।

সারাদিন শিকার করিয়া কালকেতু ঘরে ফিরিয়া খাইতে বসিত। সে খাইতে পারিত প্রচুর। অল্প খাদ্যে তাহার পেট ভরিত না। হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত, নেউল পোড়া, পুঁইশাক আর কাঁকড়া এমনি সব খাবার সে খাইত। খাইতে বসিয়া সে যখন তাহার খাবারের গ্রাস তুলিত, তখন দেখিয়া মনে হইত যে সেগুলি যেন এক একটি তে-আঁঠিয়া তাল!

কালকেতুর খাওয়ার ভারী চমৎকার বর্ণনা 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' পাওয়া গিয়াছে। তাহার বড় বড় গোঁফ ছিল। সেই গোঁফজোড়া পাছে তাহার খাবারের মধ্যে পড়িয়া যায়, সেজন্য সে উহা তাহার ঘাড়ে প্রথমে বাঁধিয়া লইত, তাহার পর আহারে বসিত।

মুচড়িয়া দুই গোঁফ বাঁধি লয় ঘাড়ে।
এক শ্বাসে দশ হাঁড়ি আমানি উজাড়ে॥
চার হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ।
ছয় হাঁড়ি মসুর-সূপ মিশাইয়া লাউ॥

এগার বৎসর বয়সে সঞ্জয়কেতু নামে এক ব্যাধের কন্যা ফুল্লরার সহিত কালকেতুর বিবাহ হইল। ফুল্লরা মেয়েটি বড় লক্ষ্মী। রূপে গুণে সে অতুলনীয়া। গরীব ব্যাধের ঘর হইতে আর এক গরীব ব্যাধের ঘরে আসিয়া সে সুখে-শান্তিতেই ছিল। দারিদ্র্যের দুঃখ তাহার হাসিমুখখানিকে ম্লান করিতে পারে নাই।

বিবাহের কিছুকাল পরে, কালকেতু একদিন শিকারে বাহির হইল। যাত্রার সময়ে সে অনেক শুভচিহ্ন দেখিয়া রওনা হইয়াছিল। ইহাতে বীরের মন আশায় ও আনন্দে ভরিয়া গিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল যে, আজ

নিশ্চয়ই শিকার বেশ ভাল মিলিবে। কিন্তু শিকারের জন্য বাহির হইয়া পথে যাইতে যাইতে একটা সোনালি রঙের গোসাপ দেখিয়া কালকেতুর সকল আশা-আনন্দ দূর হইয়া গেল। কারণ, গোসাপ যাত্রার পক্ষে অলক্ষণ। তাই রাগিয়া গিয়া কালকেতু সেই গোসাপটাকে তাহার ধনুকের গুণে বাঁধিয়া লইল এবং মনে মনে বলিল,—'যদি আজ অন্য কোন শিকার পাই, তবে ইহাকে ছাড়িয়া দিব। আর শিকার যদি না মেলে, তবে ইহাকেই শিকপোড়া করিয়া খাওয়া যাইবে।'

বাস্তবিকই কালকেতু সেদিন বনের মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোনো শিকার পাইল না। নিরাশ হইয়া অগত্যা কালকেতু সেই গোসাপটাকে লইয়াই বাড়ী ফিরিল। ফুল্লরা কালকেতুকে খালি হাতে ফিরিতে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। সেদিন যে তাহাদের ঘরে একটি খুদও নাই। তাহারা কি খাইবে! কালকেতু বলিল, এই গোসাপটাকে পোড়াইয়া আজ খাওয়া যাইবে, আর আজিকার মত প্রতিবেশী কাহারও কাছ হইতে সামান্য কিছু খুদ ধার করিয়া আন—তাহাই সিদ্ধ করিয়া ক্ষুধা মিটাইব।

স্বামীর কথায় ফুল্লরা তাহার প্রতিবেশীর কুঁড়েয় গেল কিছু খুদ ধার করিতে। কালকেতু গেল গোলাহাটে লবণ কিনিতে। গোসাপটি কুঁড়ের একপাশে লতায় বাঁধা অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

গোসাপটি কিন্তু আসলে দেবী চণ্ডী। কালকেতুর প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করিবার জন্য তিনি ঐভাবে ছল করিয়া কালকেতুর ঘরে আসিয়াছিলেন। সুতরাং কালকেতু আর ফুল্লরা তাহাদের কুটীর ছাড়িয়া বাহিরে যাইতেই—

হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ি পরিয়া পাটের শাড়ী
যোল বছরের হৈল রামা।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশীমুখী
কিবা দিব রূপের উপমা।

সেই গোসাপ কোথায় যেন মিলাইয়া গেল। তাহার জায়গায় এক অতি সুন্দরী যুবতী কালকেতুর কুঁড়ে ঘরখানি আলো করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ফুল্লরা তাহার প্রতিবেশিনীর কাছ হইতে খুদ ধার করিয়া কুঁড়েয় ফিরিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে তাহার বিস্ময়ের আর অন্ত রহিল না। আশ্চর্য্য হইয়া সে ঐ সুন্দরীকে তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে দেবী পরিহাস করিয়া বলিলেন যে, কালকেতু নিজে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছে। ফুল্লরা আর কালকেতুর সহিত ঐ কুটীরে বাস করিবার মানসেই তিনি আসিয়াছেন।

দেবীর উত্তর শুনিয়া ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাই সে প্রথমে অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া দেবীকে সেখান হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিছুতেই যখন কিছু হইল না, তখন সে তাহাদের বারোমাসের দারিদ্র্যের কথা, তাহাদের অভাব-অনটন দুঃখের কথা, সব একে একে দেবীর নিকট নিবেদন করিল। কিন্তু দেবী অচল অটল। তিনি বলিলেন যে, ঐ কুটীরে দারিদ্র্যের মধ্যেই তিনি থাকিবেন স্থির করিয়াই আসিয়াছেন। তাঁহাকে দুঃখের ভয় দেখাইয়া তাড়াইবার চেষ্টা করিলে কোন ফল হইবে না।

এইবার ফুল্লরা বড় বিপদে পড়িল। সে তখন গোলাহাটে তাহার স্বামীর কাছে ছুটিল সব ব্যাপার বলিতে।

ফুল্লরার কথা শুনিয়া কালকেতু উহা বিশ্বাস করিল না। কাজেই দুইজনে তর্ক হইতে লাগিল। ফুল্লরা বলিল, "সে যাহা দেখিয়াছে তাহা মিথ্যা নয়।" কালকেতু বলিতে লাগিল,—হইতেই পারে না। সে কোন স্ত্রীলোককে কুটীরে ডাকিয়া আনে নাই। ফুল্লরা মিথ্যা কথা বলিতেছে—ইত্যাদি।

যাহা হউক, দুইজনে এমনিভাবে তর্ক করিতে করিতে কুঁড়েয় ফিরিয়া দেখিল,—সত্যই এক অপরূপ সুন্দরী তাহাদের কুঁড়ে ঘরখানি আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

ইহা দেখিয়া কালকেতু তাঁহাকে অনেক উপদেশ দিল, অনেক অনুরোধ করিল,—তাহাদের কুঁড়েঘর ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে। কিন্তু দেবী নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কিছুতেই দেবীকে তাড়াইতে পারা যাইতেছে না দেখিয়া কালকেতু এইবার রাগিয়া গেল এবং ধনুতে বাণ জুড়িল। কিন্তু আশ্চর্য্য! বাণ সে ছুঁড়িতে পারিল না। স্থির হইয়া সেখানে সে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাতের ধনুর্ব্বাণ তাহার হাতেই রহিল। তখন দেবী মুখ খুলিলেন। তিনি বলিলেন, "কালকেতু! তুমি তোমার হাতের ধনুঃশর নামাও। আমি দেবী চণ্ডী। আমি তোমার উপর সদয় হইয়াছি। তোমায় আমি বর দিতে আসিয়াছি, ইচ্ছামত বর আমার কাছ হইতে তুমি চাহিয়া লও।"

এই কথা বলিয়া দেবী চণ্ডী কালকেতুকে একটি মাণিকের আংটি, আর সাত ঘড়া ধন দিয়া বলিলেন, "গুজরাটের বন কাটাইয়া নগর বসাইয়া তুমি সেখানকার রাজা হইও।"

চণ্ডীর আদেশে কালকেতু গুজরাটের বন কাটাইয়া নগর বসাইয়া তাহার রাজা হইল। ধনে-জনে তাহার আর সুখ-সমৃদ্ধির অন্ত রহিল না।

এই কালকেতুর গল্প ছাড়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আর একটি গল্প আছে। তাহা হইতেছে ধনপতি সদাগরের কাহিনী। উহা এইরূপ :—উজানী নগরে ধনপতি সদাগর নামে এক বণিক বাস করেন। তাঁহার অগাধ ধনরত্ন। ইঁহার পত্নী ছিল দুইটি। বড়টির নাম লহনা, ছোটটি খুল্লনা। খুল্লনা চণ্ডীর ভক্ত, তিনি নিত্য-নিয়মিত চণ্ডীর পূজা করেন; কিন্তু ধনপতি সদাগর আর লহনা চণ্ডীকে গ্রাহ্য করেন না। তাঁহারা শিবের পূজা করেন।

একবার উজানী নগরের রাজবাড়ীতে চন্দন ফুরাইল। রাজার আদেশে ধনপতি সদাগর সিংহলে যাইবার জন্য তৈয়ারী হইতে লাগিলেন। সমুদ্রযাত্রার জন্য সাতটি বড় বড় ডিঙ্গা সাজান হইল।

স্বামী সমুদ্রযাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন দেখিয়া খুল্লনার মন আশঙ্কায় ভরিয়া উঠিল। কারণ সমুদ্রযাত্রায় কত বিপদ! সুতরাং স্বামী যাহাতে

নিরাপদে সমুদ্রযাত্রা সারিয়া দেশে ফিরিয়া আসিতে পারেন, এই প্রার্থনা করিবার বাসনায় খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করিতে বসিলেন। লহনা গিয়া ধনপতিকে এই খবর দিল। একথা শুনিয়া ধনপতি সদাগরের রাগ হইল। তিনি গিয়া চণ্ডীকে 'ডাকিনী দেবতা' বলিয়া গালি দিয়া খুল্লনা যে ঘট পাতিয়া চণ্ডীর পূজা করিতেছিলেন, সেই ঘটে লাথি মারিলেন। তারপর মনে মনে শিবকে প্রণাম করিয়া ডিঙ্গায় চড়িয়া সমুদ্রযাত্রা করিলেন। ইহাতে চণ্ডী কুপিতা হইলেন।

ধনপতি সদাগরের বাণিজ্যের ডিঙ্গা যখন সাগরে পৌছিল, তখন চণ্ডীর মায়ায় সেখানে ভীষণ ঝড় উঠিল। চণ্ডীকে অপমান করিয়া তিনি সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তাই চণ্ডী তাহার শোধ তুলিবার জন্য ঝড়জল সৃষ্টি করিয়া সদাগরকে বিপদে ফেলিলেন। সেই ঝড়ে একে একে ধনপতি সদাগরের ছয় ডিঙ্গা ডুবিল। মাত্র একটি ডিঙ্গা লইয়া ধনপতি সদাগর কোনরূপে রক্ষা পাইয়া সিংহলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

সিংহলের পথে কালীদহ নামে এক জায়গায় চণ্ডীর মায়ায় তিনি এক আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলেন। দেখিলেন,—অনন্ত জলরাশির উপর এক চমৎকার পদ্মবন—সে সকল পদ্মের রংই বা কত রকমের! তাহার মাঝে এক পরমাসুন্দরী দেবী বসিয়া চারিদিক তাঁহার রূপের ছটায় আলোকিত করিয়াছেন। আর, তাঁহার বাম হাতে একটি হাতী তুলিয়া ধরিয়া একবার তাহাকে গিলিতেছেন, আবার তাহাকে উগরাইয়া হাতে লইয়া খেলিতেছেন।

ধনপতি সদাগর সিংহলে পৌছিয়া এই অপরূপ দৃশ্যের কথা ভুলিতে পারিলেন না। তিনি কথায় কথায় সিংহলের রাজাকে কালীদহের সেই কমলে-কামিনীর অপূর্ব্ব কাহিনী বলিলেন। সিংহলরাজ ধনপতি সদাগরের কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তখন ধনপতি সদাগর সিংহলরাজকে কমলে-কামিনী দেখাইতে লইয়া গেলেন। সিংহলরাজ বলিলেন যে, ধনপতি যদি ঐ দৃশ্য রাজাকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে ধনপতি সদাগরকে তিনি অর্দ্ধেক

রাজত্ব দিবেন। আর যদি না দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাকে তিনি বন্দী করিয়া যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

সকলে মিলিয়া কালীদহে গেলেন। কিন্তু চণ্ডীর মায়ায় সে'বার আর কমলে-কামিনী দেখা গেল না। কাজেই সদাগরের কারাবাস হইল।

বহুদিন কাটিয়া যায়। সদাগর আর উজানী নগরে ফেরেন না দেখিয়া খুল্লনার গর্ভজাত ধনপতি সদাগরের ছেলে শ্রীমন্ত তাহার পিতার খোঁজে বাহির হইল। রওনা হইবার সময়ে তাহার মা তাহাকে বলিয়া দিলেন, "বিপদে পড়িলে দেবী চণ্ডীকে মনে করিও; তাহা হইলে সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে।"

সাতখানি ডিঙ্গা জলে ভাসিল,—তাহার একখানিতে শ্রীমন্ত। ডিঙ্গাগুলি সিংহলের দিকে চলিল। পথে চণ্ডীর মায়ায় ভীষণ জলঝড় হইল। তখন মায়ের উপদেশে শ্রীমন্ত চণ্ডীকে স্মরণ করিল। সঙ্গে সঙ্গে সকল বিপদ কাটিয়া গেল, আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। শ্রীমন্ত শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধ প্রভৃতি পার হইয়া কালীদহে পৌছিল। ধনপতি এইখানে কমলে-কামিনী দেখিয়াছিলেন। শ্রীমন্তও সেখানে গিয়া কমলে-কামিনী দেখিল।

কমলে-কামিনী দেখিয়া শ্রীমন্তও তাহার পিতার মত সিংহলের রাজার কাছে গিয়া উহার গল্প বলিল। এবারেও রাজা তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। অবশেষে তর্ক হইতে হইতে এক অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষরিত হইল। রাজা বলিলেন যে, শ্রীমন্ত যদি তাঁহাকে কমলে-কামিনী দেখাইতে পারে, তবে তিনি তাহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্তা দিবেন। কিন্তু না দেখাইতে পারিলে তাহার মাথা কাটা যাইবে।

এবারেও শ্রীমন্তের সঙ্গে সিংহলরাজ কালীদহে গিয়া কমলে-কামিনী দেখিতে পাইলেন না। ফলে শ্রীমন্তের শিরশ্ছেদনের আদেশ হইল।

শ্রীমন্তকে মশানে লইয়া যাওয়া হইল। স্নান করিয়া সে প্রথমে তাহার পিতামাতাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। তাহার পর চণ্ডীকে স্মরণ করিল। তাহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডী তাঁহার ডাকিনী-যোগিনীদের পাঠাইয়া

দিলেন শ্রীমন্তকে মুক্তিদান করিবার জন্য। তাহারা মশানে আসিয়া সিংহল-রাজের সৈন্যসামন্তদিগকে বিষম প্রহার করিয়া মশান হইতে তাড়াইয়া দিল।

ওদিকে সিংহলরাজ স্বপ্নে দেখিলেন রাজকন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ দিলে ভাল হইবে। তখন তাঁহার মত বদলাইয়া গেল। তিনি ধনপতি সদাগরকে মুক্তি দিলেন, শ্রীমন্তকেও মুক্তি দিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ দিলেন। অবশেষে সকলে চণ্ডীর অনুগ্রহে কমলে-কামিনী দেখিয়া ধন্য হইলেন।

অতঃপর ধনপতি সদাগর তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া দেশের দিকে যাত্রা করিলেন। পথে তিনি তাঁহার হারান ডিঙ্গাগুলি ফিরিয়া পাইলেন। এইবার তিনি চণ্ডীর মহিমা বুঝিতে পারিলেন। খুব ধূমধাম করিয়া তিনি তখন চণ্ডীর পূজা করিলেন। পৃথিবীতে এই ভাবে চণ্ডীর পূজা প্রচলিত হইল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা দেখাইয়াছেন যে, চণ্ডীর পূজা করিয়া চণ্ডীর অনুগ্রহ লাভ করিলে কালকেতুর মত দারিদ্র্যমুক্ত হইয়া অসীম সুখ ও সমৃদ্ধির অধিকারী হওয়া যায়। আর ধনপতি সদাগরের মত চণ্ডীকে অবহেলা করিলে বা অপমান করিলে বিপদে পড়িতে হয়। কিন্তু তাঁহার পূজা করিলে হারানো সম্পদ পুনরায় লাভ করা যাইতে পারে। চণ্ডীর অনুগ্রহে সকল বিপদ কাটিয়া গিয়া মানুষের জীবনে সুখ শান্তি ঐশ্বর্য্য আসিয়া থাকে।

এই চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী অবলম্বন করিয়া অনেক কবিই কাব্য রচনা করিয়াছেন। মাণিক দত্ত, মুক্তারাম সেন, ভবানীপ্রসাদ, মাধবাচার্য্য—এমনি বহু কবির লেখা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কথা শুনা গিয়াছে, বা পাওয়াও গিয়াছে। তবে সব চেয়ে বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হইতেছে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমঙ্গল। মুকুন্দরামের উপাধি ছিল কবিকঙ্কণ।

মুকুন্দরামের পৈত্রিক নিবাস ছিল হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার পশ্চিমে, বর্দ্ধমান জেলার সেলিমাবাদ পরগণায় দামুন্যা নামক গ্রামে। সাত পুরুষ ধরিয়া ইঁহারা এই গ্রামে বাস করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু মামুদ সরিপ নামে এক অত্যাচারী মুসলমান শাসকের উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হইয়া

মুকুন্দরামকে সপরিবারে তাঁহার জন্মভূমি দামুন্যা পরিত্যাগ করিতে হয়। জন্মভূমি ছাড়িয়া তিনি মেদিনীপুরের আরড়া গ্রামের জমিদারের আশ্রয় ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তিনিই মুকুন্দরামকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন।

মুকুন্দরাম দুঃখের কবি ছিলেন। দুঃখবর্ণনায় তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। স্বভাবানুযায়ী চিত্রাঙ্কনে ও চরিত্র-চিত্রণেও মুকুন্দরামের জুড়ি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মেলা ভার। তাঁহার কাব্যে ব্যাধ কালকেতুর দারিদ্র্যের দুঃখ আর ধনপতি সদাগরের পত্নী খুল্লনার দুঃখের চিত্র খুবই মর্ম্মস্পর্শীরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে যে দুঃখবর্ণনা আছে তাহাতে সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের দারিদ্র্য-দুঃখই প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। নিপুণতার সহিত এমনিতর দুঃখবর্ণনায় এবং করুণ রসোদ্রেকে কবিকঙ্কণের অসামান্য কৃতিত্ব ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের করুণ-রসপূর্ণ বর্ণনায় পাঠকের অশ্রু উদ্বেল হইয়া উঠে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অপর বিশেষত্ব—সেকালের রাষ্ট্র, সমাজ, গৃহস্থালী ও ধর্ম্মবিশ্বাস প্রভৃতির বিবরণ এই কাব্যের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া আছে। তখনকার সামাজিক রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান অথবা ধর্ম্মকর্ম্মের কথা জানিতে হইলে মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য হইতে তাহার একটি সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

একসময়ে মনসামঙ্গল কাব্যসকল যেমন বাংলাদেশে জনপ্রিয় হইয়াছিল, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও ঠিক তেমনি জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিয়াছিল। বাংলার গ্রামে গ্রামে নানাপ্রকার বাদ্যের সহিত সঙ্গত করিয়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্যসকল গীত হইত। শত শত লোক সেই গান শুনিতে আসিত—গান শুনিয়া কখনও হাসিত, কখনও কাহিনীর করুণ বর্ণনায় দুঃখে চোখের জল ফেলিত।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য

চণ্ডী, মনসা প্রভৃতির কাহিনী লইয়া বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে যেমন কত মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল, তেমনি 'ধর্ম্মঠাকুর' নামে এক দেবতার মহিমাগান করিয়া আর এক শ্রেণীর মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল।

এখনও বাংলার নানাস্থানে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দির, ধর্ম্মঠাকুরের পূজা দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মঠাকুরের কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল একটি প্রস্তরখণ্ড ধর্ম্মঠাকুরের প্রতীক। ঐ প্রস্তরখণ্ডকে ধর্ম্মঠাকুররূপে কল্পনা করিয়া পূজা করা হইত, বা এখনও পূজা করা হইয়া থাকে। এই ধর্ম্মঠাকুরকে শক্তিশালী এবং জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রচার করিয়া যে সকল কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহা 'ধর্ম্মমঙ্গল' নামে বিখ্যাত হইয়াছে। ধর্ম্মমঙ্গলসকলের মধ্যে রামাই পণ্ডিত নামে এক কবির লেখা 'শূন্য-পুরাণ' আর ময়ূর ভট্ট নামে এক কবির লেখা 'ধর্ম্মপুরাণ'ও খুব বিখ্যাত। এই কাব্য দুইখানিতে ধর্ম্মঠাকুরের জন্মের কথা আর তাঁহার পূজা কি করিয়া করিতে হয়, তাহার কথা বর্ণনা করা হইয়াছে। এ ছাড়াও অনেক ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, যেমন—খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলী, রূপরাম, সীতারাম, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী, বলদেব চক্রবর্ত্তী, সহদেব চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির ধর্ম্মমঙ্গল। এই সকল ধর্ম্মমঙ্গলের কতকগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকে লেখা, কতকগুলি অষ্টাদশ শতকের।

এই 'ধর্ম্মমঙ্গলে'র আদি কবি কে তাহা লইয়া মতভেদ আছে। ধর্ম্মমঙ্গলের কবি ঘনরাম তাঁহার কাব্যে বলিয়াছেন—'ময়ূরভট্ট বন্দিব সঙ্গীতের আদি কবি।' ইহাতে মনে হয় ময়ূরভট্ট খুব সম্ভবত ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে আবার খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। পরবর্ত্তী কোন কোন ধর্ম্মমঙ্গলে আবার রূপরামকে ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে।

সে যাহাই হউক,—যিনিই ধর্ম্মমঙ্গলের আদি কবি হউন না কেন,—আমরা এই ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের কয়েকজন কুশলী কবির সন্ধান পাইয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে রূপরাম একজন।

রূপরামের ধর্ম্মমঙ্গলের কাহিনী খুবই করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী। এই কাব্যে সেই মধ্যযুগের বাঙ্গালী জীবনের যেরকম বাস্তব চিত্র আছে, সেরূপ দৃষ্টান্ত এক কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ভিন্ন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও বড় একটা নাই। রূপরামের কাব্যের চরিত্রগুলি বাস্তব। বাস্তব চিত্র-চিত্রণ ও চরিত্রাঙ্কনের জন্য মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যে কয়খানি কাব্য বিখ্যাত হইয়াছে, তাহার মধ্যে রূপরামের 'ধর্ম্মমঙ্গল' একটি। ঘনরাম ও মাণিক গাঙ্গুলীর 'ধর্ম্মমঙ্গল'ও খুব বিখ্যাত। মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গলে হাস্যরসের স্ফূর্ত্তি বেশ হইয়াছে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে লাউসেনের কাহিনী বর্ণনা করা হইয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের অনুগ্রহে এই লাউসেনের সাহস ও যুদ্ধকুশলতার সীমা ছিল না। কাহিনীটি এইরূপ ঃ—মেদিনীপুরে ময়নাগড় নামে একটি জায়গা। সেখানকার রাজা কর্ণসেন। তিনি গৌড়ের রাজার অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজ্য চালান। কিন্তু অজয় নদীর তীরে ঢেকুর নামে একটি জায়গার রাজা ইছাই ঘোষ কাহাকেও ভয় করেন না—গৌড়েশ্বরকেও না। এই ইছাই ঘোষ জাতে গোয়ালা, কালীভক্ত। কালীর বরে তিনি অসীম শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছেন।

রাজা কর্ণসেন ইঁহার সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। অবশেষে তিনি গেলেন গৌড়েশ্বরের কাছে। গিয়া কাঁদিয়া পড়িয়া বলিলেন—

এতদিনে মহারাজ রাজ্য দেশ গেল ॥
ইছাই হইল রাজা ঢেকুর ভিতরে।
আপনে আছেন দুর্গা ইছাইর ঘরে ॥
আজি কালি হানা দিবে গৌড় উপরে।

"ইছাই ঘোষের প্রতাপ এমন হইয়াছে যে অল্পকালের মধ্যে তিনি গৌড়রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবেন"—এমনি কথা শুনিয়া গৌড়শ্বরের খুব

রাগ হইল। তিনি কর্ণসেনকে সৈন্য দিয়া ইছাইয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে বলিলেন। উভয়ের যুদ্ধ হইল। কিন্তু ইছাই ঘোষকে পরাজিত করা গেল না, সে যুদ্ধে কর্ণসেনই হারিলেন এবং ছয় ছেলে হারাইয়া তিনি বিলাপ করিতে করিতে কাঁদিয়া আসিয়া পড়িলেন গৌড়েশ্বরের কাছে। বলিলেন যে, "রাজত্ব করিবার সখ আমার মিটিয়াছে। পুত্রশোকে আমার পাটরাণী বিষ খাইয়া মরিয়াছে। আর আমার সংসারে থাকার প্রয়োজন নাই, আমি সন্ন্যাসী হইব। সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া যাইবার আগে খবরটা কেবল আপনাকে জানাইয়া গেলাম।"

কর্ণসেনের দুরবস্থায় গৌড়েশ্বর বড়ই দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহাকে সংসারী করার জন্য তিনি তাঁহার পাটরাণী ভানুমতীর ভগ্নী রঞ্জাবতীর সহিত কর্ণসেনের বিবাহ দিলেন। রঞ্জাবতী তখন পূর্ণযৌবনা, অতুলনীয় তাঁহার রূপ। আর কর্ণসেন তখন পক্ককেশ বৃদ্ধ। তাই এ বিবাহে রঞ্জাবতীর ভাই মহামদ খুব আপত্তি করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই, কর্ণসেনের সহিত রঞ্জাবতীর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরও মহামদ তাহার ভগ্নীকে কর্ণসেনের ঘর করিতে নিষেধ করিয়াছিল। কিন্তু রঞ্জাবতী ভাইয়ের কথা শুনেন নাই। তিনি কর্ণসেনের ঘর করিতে গেলেন। ইহাতে মহামদ নিজ ভগ্নীর উপর মনে মনে চটিয়া রহিলেন এবং তাঁহার অনিষ্ট করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন।

রঞ্জাবতী ছিলেন ধর্ম্মঠাকুরের পূজারিণী। ধর্ম্মদেবতার অনুগ্রহে তাঁহার মহাবিক্রমশালী এক পুত্র জন্মিল—তাহার নাম হইল লাউসেন। লাউসেন বড় হইতে লাগিল।

ওদিকে রঞ্জাবতী তাহার ভাই মহামদের কথা অমান্য করিয়া স্বামীর ঘর করিতে গিয়াছিল বলিয়া, মহামদ নিজ ভাগিনেয় লাউসেনের নানারকম অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ধর্ম্মঠাকুর লাউসেনকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে লাউসেন যৌবনের সীমায় উপনীত হইল। মহামদ তখন গৌড়েশ্বরকে কুমন্ত্রণা দিল—গৌড়েশ্বর মহামদের

কুমন্ত্রণায় ভুলিয়া লাউসেনকে ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। লাউসেন ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধ সুরু করিল। তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল।

কিন্তু লাউসেন যে ধর্ম্মঠাকুরের অনুগৃহীত! তাই ইছাই ঘোষ লাউসেনের কিছু করিতে পারিলেন না। লাউসেনের সেনাপতি কালু ডোম,—যুদ্ধ করিতে করিতে মরিয়াও সে বাঁচিয়া উঠিল ধর্ম্মঠাকুরের অনুগ্রহে। লাউসেন এই যুদ্ধে জয়ী হইল,—ইছাই ঘোষের মাথা কাটিয়া ফেলিয়া সে একাধারে তাহার পিতার রাজ্যের কণ্টক ও গৌড়েশ্বরের রাজ্যের কণ্টক উৎপাটিত করিল।

এই লাউসেন ধর্ম্মঠাকুরের কৃপায় শুধু যে অজেয় ইছাই ঘোষকে জয় করিয়াছিল তাহা নহে। ধর্ম্মমঙ্গলের কবিরা দেখাইয়াছেন যে, ধর্ম্মঠাকুরের অনুগ্রহে সে বাঘ, হাতী প্রভৃতি বনের ভীষণ ভীষণ জন্তুদিগকেও বশ করিয়াছে। বহু অলৌকিক কাজ সে করিয়াছে—মৃত শিশুর মুখে কথা ফুটাইয়াছে, মৃত সৈন্যের প্রাণ দান করিয়াছে। ধর্ম্মঠাকুরের অনুগ্রহ লাভ করিয়া এমনিতর অনেক অসাধ্যসাধন করার কথা ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যসমূহে বেশ ফলাও করিয়া বলা হইয়াছে।

নাথ-সাহিত্য

মঙ্গলকাব্য ছাড়া মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে আর এক শ্রেণীর কাব্য বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহা নাথ-সাহিত্য নামে পরিচিত। গোরক্ষবিজয়ের কাহিনী আর ময়নামতীর কাহিনী এই নাথ-সাহিত্যের অন্তর্গত। একই মঙ্গলকাব্যের যেমন বিভিন্ন কবি পাওয়া গিয়াছে, গোরক্ষবিজয় ও ময়নামতীর গানেরও তেমনি অনেক কবি পাওয়া গিয়াছে। অর্থাৎ, পর পর বহু কবিই হয় গোরক্ষবিজয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন অথবা ময়নামতীর গান রচনা করিয়াছেন।

অনেকের মত এই যে,—গোরক্ষবিজয় কাহিনী ও ময়নামতীর গান—বৌদ্ধগান ও দোঁহার সমসাময়িক কালে বা উহার ঠিক পরবর্ত্তী কালে, বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন যুগেই রচিত হইয়াছিল। কিন্তু যে অবস্থায় এই কাহিনী ও গানের লিখিত পুঁথিগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভাষা খুব প্রাচীন নয়। সুতরাং গোরক্ষবিজয় কাহিনী ও ময়নামতীর গানের আখ্যায়িকা হয়ত প্রাচীন, কিন্তু লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হইতে হইতে এবং গানের আকারে একযুগ হইতে অন্যযুগে প্রচলিত থাকায় উহাদের ভাষার অনেক অদল-বদল হইয়া গিয়াছে এবং আসল গল্পের সঙ্গে অনেক নূতন গল্প মিলিয়া-মিশিয়া ইহাদের রূপ বদলাইয়া গিয়াছে।

বুদ্ধের প্রচারিত ধর্ম্মের প্রভাব এক সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বাংলায়ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বাংলায় কমিতে থাকে এবং নানা কারণে ঐ ধর্ম্মের নানারকম রূপান্তরও হইতে থাকে। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে শৈবধর্ম্ম মিশিয়া বাংলায় একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মের অভ্যুদয় হয়। তাহাই নাথধর্ম্ম। নাথ-সাহিত্যে এই নাথধর্ম্মের মহিমার কথাই রহিয়াছে।

এই নাথধর্ম্মের গুরু ছিলেন মীননাথ। মীননাথের শিষ্য গোরক্ষনাথ। মীননাথ ও গোরক্ষনাথ উভয়েই সিদ্ধপুরুষ—উভয়েই অলৌকিক ক্ষমতাশালী। ইঁহাদের কাহিনীই গোরক্ষবিজয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে। কাহিনীটি এইরূপ :—

গোরক্ষবিজয় কাহিনী

পার্ব্বতী একদিন শিবের কাছে "মহাজ্ঞান" জানিতে চাহিলেন। এই তত্ত্ব জানিলে জন্মমৃত্যুর সমস্ত রহস্য জানা যায়, মৃত্যুকে এড়ানো যায়, এমন কি মড়াকেও বাঁচানো যায়।

পার্ব্বতীর অনুরোধে শিব নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহাকে সেই পরম তত্ত্ব মহাজ্ঞান শুনাইতেছিলেন। ওদিকে মীননাথ সেখানেই জলের নীচে তপস্যা করিতেছিলেন। কাজে কাজেই তিনিও মহাজ্ঞান শিখিয়া ফেলিলেন। তাঁহার

অসীম শক্তি হইল। তখন তিনি দেশে দেশে ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কত অসাধ্য-সাধন করিতে লাগিলেন! সকলেই তাঁহার অলৌকিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া তাঁহার অনুগত হইতে লাগিল।

মীননাথের এমনিতর প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয়া পার্ব্বতী তাঁহাকে পরখ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন, এবং তাঁহাকে ভুলাইতে তিনি নানারকমের মায়ার জাল পাতিলেন। দেবীর মায়ায় মীননাথ হার মানিলেন, তাঁহার অন্যান্য শিষ্যেরাও সকলে হার মানিল। একমাত্র গোরক্ষনাথ দেবীর পরীক্ষায় জয়ী হইলেন।

সন্ন্যাসী হইয়াও ভোগবিলাসের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই বলিয়া মীননাথ আর তাঁহার শিষ্যেরা সংসারী হইয়া গেলেন। মীননাথ গেলেন দক্ষিণ দেশে কদলীপত্তন নামে এক জায়গায়। সেখানে রাজা ছিল না, তিনি রাজা হইলেন। রাণী, দাসদাসী, লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজ প্রভৃতি লইয়া সেখানে তিনি খুব ধূমধামের সঙ্গে রাজত্ব করিতে লাগিয়া গেলেন। কোথায় গেল তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, তাঁহার সংযম, অলৌকিক শক্তি আর প্রভাব। ভোগবিলাসের স্রোতে তিনি নিজেকে দিলেন ভাসাইয়া। সন্ন্যাসীর কোন মহিমাই তাঁহার মধ্যে আর থাকিল না। 'মহাজ্ঞান' ইত্যাদি ভুলিয়া তিনি সংসারী সাজিলেন।

কদলীপত্তনের রাণীরা টের পাইয়াছিলেন যে, মীননাথ একজন যোগী ছিলেন, এখন যোগ ভুলিয়া সংসারী হইয়াছেন। সেইজন্য যোগী দেখিয়া পাছে তিনি পুনরায় সংসারের প্রতি উদাসীন হন এবং সংসার রাজ্য সব ছাড়িয়া চলিয়া যান, এই কারণে তাঁহারা কদলীপত্তনে যোগীদের ঢোকা নিষেধ করিয়া দিলেন। কাজে কাজেই পাইকেরা—

পরদেশী যোগী পাইলে লইয়া যায় ধরি'।
দক্ষিণ পাটনে নিয়া তারে ফেলায় মারি।

সুতরাং কোন যোগী-সন্ন্যাসীই আর মীননাথের রাজ্যে প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না।

ওদিকে গোরক্ষনাথ শুনিলেন যে—

অজ্ঞান হইল মীন জ্ঞান নাহি আর।
বলবীর্য্যহীন হইছে অস্থিচর্ম্মসার॥

গুরুর শোচনীয় পরিণামের কথা শুনিয়া গুরুভক্ত শিষ্য গোরক্ষনাথের খুব মনঃকষ্ট হইল। তিনি গুরু মীননাথের সন্ধানে যাত্রা করিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার গুরু কদলীপত্তন নামক স্থানের রাজা হইয়া আছেন।

গেলেন সেখানে। কিন্তু সে রাজ্যে রাজার সঙ্গে দেখা করা বড় কঠিন। সে রাজ্যের ত্রিসীমানায় কোন সাধু-সন্ন্যাসীকে আসিতে দেওয়া হয় না। বুড়া সন্ন্যাসী হইলে মারের চোটে তাহারা তাহার গাল ভাঙ্গিয়া দেয়, যুবা হইলে তাহাকে শূলে দেওয়া হয়; আধাবয়সী হইলে তাহাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করা হয়, আর শিশু হইলে তাহাকে শিলে রাখিয়া বাটনা বাটার মত করিয়া বাটা হয়। সাধু-সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সে রাজ্যে এমনি কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা!

তবে কি করিয়া মীননাথের সম্মুখে যাওয়া যায়? গুরুর সঙ্গে গোরক্ষনাথের যে দেখা করা চাই-ই! গুরু মহাজ্ঞান ভুলিয়া সংসারী হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার ভুল ভাঙ্গিয়া তাঁহাকে যে উদ্ধার করা চাই!

গোরক্ষনাথ ঠিক করিলেন, তিনি নারীরূপ ধারণ করিবেন—নটী সাজিয়া নাচ-গান শুনাইবার ছলে কদলীপত্তনের রাজবাড়ীতে ঢুকিবেন। কারণ রাজপুরী-মধ্যে কোন পুরুষকে যাইতে দেওয়া হয় না, শুধু যাহারা নর্ত্তকী তাহাদিগকেই সেখানে যাইতে দেওয়া হয়।—

পুরুষের গতি নাহি পুরীর মাঝার।
নাট-নাটুয়া তারা পারে জাইবার॥

সুতরাং গোরক্ষনাথ নানারকম সাজসজ্জা করিয়া নর্ত্তকীর ছদ্মবেশে রাজপুরীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার গলায় হার, হাতে কঙ্কণ, কানে

কুণ্ডল, পায়ে সোনার নূপুর। ছদ্মবেশধারী গোরক্ষনাথকে চেনা যাইতেছিল না। সুন্দরী একজন নর্ত্তকী বলিয়াই তাঁহাকে মনে হইতেছিল।

রাজবাড়ীতে নাচ-গানের আসর বসিল। রাজা, রাণী, পাত্র-মিত্র সবাই শুনিতে বসিলেন। গোরক্ষনাথ নর্ত্তকীবেশে নাচিতে লাগিলেন। কি সুন্দর সে নৃত্য, কি মধুর তাঁহার হাতের মৃদঙ্গের বোল! নাচিতে নাচিতে গোরক্ষনাথ নানারকম শক্তির পরিচয় দিলেন। জলের মধ্যে থালা রাখিয়া তাহার মধ্যে তিনি নাচিলেন। কখনও নৃত্যের লঘু-পদসঞ্চারে মনে হইল পা বুঝি তাঁহার মাটিতে পড়িতেছে না। সকলে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। গোরক্ষনাথের মৃদঙ্গের বোলে এবং নাচের ছন্দে ক্রমাগত কিন্তু একটা কথা ধ্বনিত হইতেছিল—কায়া সাধ, কায়া সাধ! অর্থাৎ, দেহ শুদ্ধ কর, দেহ শুদ্ধ কর!

ইহা শুনিয়া মীননাথ অস্থির হইলেন। তিনি নির্জ্জনে নর্ত্তকীবেশধারী গোরক্ষনাথের সহিত আলাপ করিলেন। সেই সময়ে মীননাথ গোরক্ষনাথকে চিনিতে পারিলেন—সন্ন্যাসধর্ম্ম ভুলিয়া সংসারী সাজিয়া যে অন্যায় করিয়াছেন তাহাও মীননাথ বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু রাজত্ব ত্যাগ করিতে তিনি প্রথমটায় রাজী হইলেন না। কাজেই গোরক্ষনাথ গুরুকে নানা উপদেশ দিলেন। শেষ পর্য্যন্ত গুরুর মন ফিরিল, তিনি তাঁহার 'মহাজ্ঞান' ফিরিয়া পাইলেন এবং রাজ্য সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ময়নামতীর গান

এই নাথ-ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আর একটি গল্প লইয়াও মধ্যযুগে কতকগুলি কাব্য রচিত হয়। সেগুলি গোপীচাঁদের গান, গোবিন্দচন্দ্রের গান বা ময়নামতীর গান নামে বিখ্যাত। সে গল্পটি এই:—বাংলাদেশের মেহেরকুল নামে এক রাজ্য, সেখানকার রাজা তিলকচন্দ্র। তিলকচন্দ্রের মেয়ে শিশুমতি।

একবার রাজবাড়ীতে যোগিশ্রেষ্ঠ গুরু গোরক্ষনাথ আসিলেন। শিশুমতি পরম আগ্রহে তাঁহার সেবাযত্ন করিলেন। তাঁহার সেবায় সন্তুষ্ট হইয়া গোরক্ষনাথ

তাঁহাকে 'মহাজ্ঞান' শিখাইয়া দিলেন এবং নিজের শিষ্যা করিয়া লইয়া তাঁহার নাম রাখিলেন ময়নামতী। গুরুর কৃপায় ময়নামতী ছেলেবেলা হইতেই যোগসিদ্ধা হইয়া উঠিলেন।

বিবাহের বয়স হইলে, বাংলার রাজা মাণিকচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হইল। মাণিকচন্দ্র রাজার আরও অনেক রাণী ছিল। তাঁহাদের সঙ্গে ময়নামতীর বনিত না। তাই রাজা তাঁহাকে ফেরুসা নামে এক গ্রামে বসবাস করিতে পাঠাইয়া দিলেন।

দিন যায়। রাজার মৃত্যু আসন্ন হইল। তিনি মৃত্যুকালে ময়নামতীকে দেখিতে চাহিলেন। ফেরুসা হইতে ময়নামতী আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া ময়নামতী রাজার মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া তাঁহাকে 'মহাজ্ঞানে'র মন্ত্র দিতে চাহিলেন—এই মন্ত্র গ্রহণ করিলে রাজার আর মৃত্যু হইবে না, একথা বলিলেন। কিন্তু রাজা মাণিকচাঁদ কিছুতেই স্ত্রীর নিকট কোন বিদ্যা শিখিতে চাহিলেন না। তাঁহার মনে হইল—স্ত্রীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিব? ইহাতে অপমান হইবে।

রাজা 'মহাজ্ঞান' শিখিলেন না। কাজে কাজেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ময়নামতীর ছেলে গোপীচাঁদ রাজা হইলেন। গোপীচাঁদের বয়স তখন অল্প।

গোপীচাঁদের জন্মকালে দৈবজ্ঞ গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে, উনিশ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু যদি বারো বৎসরের জন্য তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে তাঁহার ফাঁড়া কাটিয়া যাইবে। তাই ময়নামতী পুত্রকে সন্ন্যাসী হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। বলিলেন—যোগসিদ্ধ যোগী হইলে অমর হওয়া যায়। ইহা শুনিয়া গোপীচাঁদ জিজ্ঞাসা করিলেন,—মা তুমি ত যোগ শিখিয়াছ, তোমার কি মৃত্যু নাই? ময়নামতী বলিলেন,—না, তুমি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার।

ময়নামতী পরীক্ষা দিলেন। তিনি আগুনে ঝাঁপ দিলেন, ফুটন্ত তেলের কড়াইয়ে তাঁহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইল,—কিন্তু কিছুতেই রাণী ময়নামতীর

এতটুকু অনিষ্ট হইল না। মহাজ্ঞানের প্রভাবে তিনি অক্ষতই রহিলেন। ইহা দেখিয়া গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হইতে রাজি হইলেন। কিন্তু গোপীচাঁদ রাজি হইলেন ত' তাঁহার রাণীরা রাজি হন না। তাঁহারা অনেক কান্নাকাটি করিলেন, সন্ন্যাস-জীবনের কষ্টের কথা বলিয়া গোপীচাঁদকে ফিরাইতে কত চেষ্টা করিলেন। বনের বাঘ-ভালুকের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। গোপীচাঁদ সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্য-সংসার সব ছাড়িয়া গেলেন।

বারো বছর কাটিল। এই বারো বছরে রাজা সন্ন্যাসী হইয়া দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, সন্ন্যাসধর্ম্মের বহু দুঃখ-কষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে হইল। কিন্তু সকল কষ্ট সহিয়াও তিনি সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইলেন না—কষ্ট সহিয়াও একদিনের জন্য সংসারের আরাম-বিলাসের মধ্যে ফিরিবার বাসনা তাঁহার জাগিল না। তিনি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বারো বৎসর বাদে প্রাসাদে ফিরিলেন। তাঁহাকে তখন চেনা যায় না—মাথায় মস্ত জটাভার, মুখে একমুখ দাড়ি, তাঁহার হাতে সন্ন্যাসীর কমণ্ডলু, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, পরণে সন্ন্যাসীর গেরুয়া ধুতি-চাদর।

রাণীরা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া কুকুর লেলাইয়া দিলেন। কুকুর কিন্তু তাহার পুরান মনিবকে চিনিতে পারিয়া ছুটিয়া আসিয়া গোপীচাঁদের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। রাজবাড়ীর পুরাতন হাতী মনিবকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িল। রাণীরা এইবার গোপীচাঁদকে চিনিতে পারিল। শোকে দুঃখে এতদিন তাহাদের দিন কাটিতেছিল। রাজাকে ফিরিয়া আসিতে দেখিয়া তাহারা আবার আনন্দসাগরে ভাসিল। মাথার জটা মুড়াইয়া গোপীচাঁদ সিংহাসনে বসিলেন, রাজ্যময় আনন্দের হাট বসিয়া গেল।

মঙ্গলকাব্যগুলিতে যেমন দেবদেবীর অনুগ্রহে অর্থ সম্পদ সমৃদ্ধি লাভের কথা আছে অথবা দেবদেবীর মহিমার কথা আছে, গোরক্ষবিজয় এবং ময়নামতীর গানে তেমনি যোগের মাহাত্ম্যের কথা রহিয়াছে। যোগের প্রভাবে মৃত্যু জয় করার কাহিনীই গোরক্ষবিজয় এবং ময়নামতীর গানের

বর্ণনার বিষয়। মঙ্গলকাব্যে দেখি,—দেবদেবীর অনুগ্রহে মানুষ জীবনে কত সুখ সম্পদ্ পাইয়াছে, তাহাদের জীবনের বিপদ-আপদ কাটিয়া গিয়াছে। আর নাথ-সাহিত্যে দেখি,—যোগবলে মানুষ মৃত্যু জয় করিয়াছে।

এই গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান এককালে খুবই জনপ্রিয় ছিল, এবং বাংলার সর্ব্বত্রই এই দুইটি কাহিনী গীত হইত। এখনও আমাদের দেশের কোন কোন জায়গায়—বিশেষতঃ বাংলার উত্তরাঞ্চলে রংপুর জেলায় গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গান শুনিতে পাওয়া যায়। একসময়ে এই দুই কাহিনীর মধ্যে গোপীচন্দ্রের গানের কাহিনীটি এমনই জনপ্রিয় হইয়াছিল যে, মারাঠী, গুজরাটি, পাঞ্জাবী, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষাতেও ইহাদের অনুবাদ হয়। পাঞ্জাবে, মহারাষ্ট্র দেশে, উড়িষ্যায় গোপীচাঁদের সন্ন্যাসগ্রহণের করুণ কাহিনী এখনও চলিত আছে।

এই নাথ-সাহিত্য—গোরক্ষবিজয় আর গোপীচন্দ্রের গান—গ্রাম্য কবি-দিগের রচনা। তাই ইহাদের ভাষায় পাণ্ডিত্যের আড়ম্বর নাই, অতি সরল ভাষায়, অনাড়ম্বর রীতিতে এই সকল রচনা করা হইয়াছে। গ্রাম্য কবিদিগের বর্ণনা বলিয়া গোরক্ষবিজয় ও গোপীচাঁদের গানের ভাষা ও বর্ণনারীতি অত্যন্ত সাদাসিধা বটে, তথাপি ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট কবিত্বও আছে।

গোপীচন্দ্রের গান করুণরসের প্রস্রবণ, সরস কবিত্বে দীপ্তিমান্। গোপী-চাঁদের সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্পে তাঁহার রাণীদের বিলাপে ও রাজ্যশুদ্ধ সকলকার আক্ষেপে এই করুণরস শতধারে উৎসারিত হইয়াছে।—

গাছ কাঁদে গাছালি কাঁদে, কাঁদে গাছের পাতা।
বনের হরিণী কাঁদে হেঁট করিয়া মাথা ॥
ঘাটোয়ালের ঘাটে কাঁদে বাইশ কাহন নাও।
বাইশ কাহন নৌকা কাঁদে. তেইশ কাহন দাঁড়ী।
তাহার মাঝে কাঁদে বিশ্বম্ভর কাণ্ডারী ॥
হাতীশালের হাতী কাঁদে, ঘোড়াশালের ঘোড়া।
রাণীরা যে কাঁদে তাতে ভিজে জামাজোড়া ॥

একশত গাভী কাঁদে গলায় লেজ দিয়া।
নর বুড়ী কুত্তা কাঁদে চরণে পড়িয়া ॥
একশত রাণী কাঁদে মৃত্তিকায় গড়াইয়া।
অদুনা পদুনা কাঁদে চরণ ধরিয়া ॥

অদুনা, পদুনা গোপীচাঁদের রাণী। তাঁহারা ব্যাকুল ক্রন্দনে রাজাকে বলিয়াছিলেন—

না যাইও, না যাইও রাজা, দূর দেশান্তর!

তারপর যখন কিছুতেই রাজা গোপীচাঁদকে ফিরান সম্ভব নয় বুঝিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা রাজার সঙ্গে যাইবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—তোমার সঙ্গে আমাদের লইয়া চল, আমরা—

রান্ধিয়া দিমু অন্ন তোমার ক্ষুধার কালে।
পিপাসার কালে দিমু পানি ॥

গোপীচন্দ্র কিন্তু রাণীদের সঙ্গে লইবেন না। তাই দেখি যে, তিনি তাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছেন—

আমার সঙ্গে যাবু রাণী, পন্থের শোন্ কাহিনী।
খিদা লাগলে অন্ন পাবু না, পিয়াস লাগলে পানি ॥
শালবন শিমুলবন চলিতে মান্দার।
যেদিকে হাঁটে হাড়ি-গুরু সেদিকে আন্ধার ॥
স্ত্রী আর পুরুষে যদি পান্থ বাহিয়া যায়।
হেন বা দুষ্ট বাঘ আছে নারী ধরি' খায় ॥
খাইবে না খাইবে বাঘে ফ্যালাবে মারিয়া।
বৃথা কাজে ক্যান মরবু আমার সঙ্গে যাইয়া ॥

উত্তরে রাণী দুইজন বলিয়াছেন—

"......শুন রাজা রসিক নাগর ॥
কারে কয় এগিলা কথা কে আর পইতায়।

এমন দুষ্ট বনের বাঘ স্ত্রী-পুরুষ বাছিয়া খায়!
থাক্না ক্যানে বাঘের ডর তাক না করি ডর।
নিষ্কলঙ্ক মরণ হউক সোয়ামীর পদের তল॥

গোপীচন্দ্র ও তাঁহার দুই রাণীর এমনিতর উক্তি-প্রত্যুক্তির মধ্য দিয়া একদিকে করুণ ভাব, অন্যদিকে মধুর হাস্যরস কি সুন্দররূপেই না উৎসারিত হইয়াছে! স্বামীর প্রতি স্ত্রীর নির্ভরতা ও ভক্তিও কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে!

গোরক্ষবিজয় ও গোপীচন্দ্রের গানের ঐতিহাসিক মূল্যও কম নহে। ইহাদের মধ্যে তৎকালীন রীতিনীতি, সমাজচিত্র, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ও সাধারণ লোকেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখের একটি সুস্পষ্ট আলেখ্য পাইয়াছি। বাংলার গ্রামগুলির সহিত—গ্রাম্যজীবনের সহিত—গাথাগুলির অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সর্ব্বত্রই গ্রামের কথা, তাহার ছড়া, গ্রাম্য প্রবাদবাক্য—গ্রাম্য পশুপক্ষীর বিবরণ।

লোকসাহিত্য

সকল দেশেই জনসাধারণের আবশ্যকসাধন ও অবসররঞ্জনের জন্য এক শ্রেণীর সাহিত্যের প্রয়োজন চিরকালই ছিল বা আছে। তাহা লোকসাহিত্য। লোকরঞ্জনের উদ্দেশ্যে এই সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তাহাই সেই জাতির লোকসাহিত্য।

অন্যান্য দেশের মত বাংলারও একটি বিশেষ লোকসাহিত্য আছে। এদেশে ইংরাজি শিক্ষার স্রোতে সেই সাহিত্যের ধারা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া বর্ত্তমানে প্রায় লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু এমন এক সময় ছিল যখন বাংলার এই লোকসাহিত্যই বাংলার প্রাণকেন্দ্র গ্রামের অধিবাসীদের একাধারে আনন্দ এবং শিক্ষা দান করিত। ঐগুলিতে "কল্পনার তান অধিক থাক বা না থাক, আনন্দের সুর ছিল।" গ্রামের লোকেরা যে জীবন প্রতিদিন

ভোগ করিয়া আসিতেছে, লোকসাহিত্যের কবিগণ সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তুলিয়াছেন দেখিতে পাই। গ্রামের হৃদয় ভাষা পায় লোকসাহিত্যে। পূর্ব্বকালে নানা আনন্দ-উৎসবে, পাল-পার্ব্বণে গ্রামের হৃদয় লোকসাহিত্যের ভিতর দিয়া উৎসারিত হইত। বাংলার লোকসাহিত্য বাঙ্গালীর প্রয়োজনে আপনা-আপনিই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মকথা সংস্কৃত ভাষার মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। সাধারণ বাঙ্গালীর মন উহার নাগাল পাইত না। তাই বাংলার অর্দ্ধখ্যাত ও অখ্যাত কবিরা ধর্ম্মের কথাকে, নীতিকে, বাংলার সংস্কৃতিকে সকলের মনের দ্বারে সহজ সুরে পৌছাইয়া দিবার জন্যই রচনা করিয়াছিলেন অজস্র ছড়া, ব্রতকথা, পাঁচালী, রূপকথা, পল্লীগাথা, কবিসঙ্গীত, বাউল-ভাটিয়ালী গান এবং এমনি আরও কত কি। এইগুলিই পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালীকে আনন্দ দিয়াছে, শিক্ষাও দিয়াছে।

বাঙ্গালীর এই অপরূপ লোকসাহিত্যই বাঙ্গালীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এইগুলিই বাঙ্গালীর প্রাণের বস্তু। তাই লোকস্মৃতির কষ্টিপাথরে জনসাধারণের জন্য উদ্ভাবিত এই সাহিত্য চিরকাল উজ্জ্বল হইয়াই রহিয়াছে।

লোকসাহিত্যের ছড়া বা কবিতাগুলি কোনো নিপুণ শিল্পীর উদ্ভাবিত নহে। উহাদের ভাব মাঝে মাঝে অসংলগ্ন, ছন্দ অসম্পূর্ণ। তবু ইহাদের মধ্যে অনেকদিনের হাসি-কান্না মুদ্রিত হইয়া আছে, ইহার ভাঙ্গাচোরা অসম্পূর্ণ ছন্দের মধ্যে কত মানুষের হৃদয়বেদনা সংলগ্ন রহিয়াছে!

ছড়া

লোকসাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ ছেলেভুলানো ছড়াগুলি।

ছেলে ঘুমাইতে চাহিতেছে না, দুষ্টামি করিতে চায়। স্নেহময়ী মা সেই দুরন্ত ছেলেকে কোলে ফেলিয়া গাহিলেন—

খোকা গেল মাছ ধরতে ক্ষীর নদীর কূলে।
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে, মাছ নিয়ে গেল চিলে॥

কিংবা—

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে।
যমুনা যাবেন শ্বশুরবাড়ী কাজিতলা দিয়ে॥
কাজি ফুল কুড়ুতে গিয়ে পেয়ে গেলুম মালা।
হাত ঝুমঝুম, পা ঝুমঝুম, সীতারামের খেলা॥
নাচ ত সীতারাম কাঁকাল বেঁকিয়ে।
আলোচাল দেব টাপাল ভরিয়ে॥
আলোচাল খেতে খেতে গলা হল কাঠ।
হেথায় ত জল নেই ত্রিপূর্ণির ঘাট॥
ত্রিপূর্ণির ঘাটে দুটো মাছ ভেসেছে।
একটি নিলেন গুরু ঠাকুর একটি নিলেন কে?

অমনি উহা মোহমন্ত্রের কাজ করিল। মায়ের গাওয়া ছড়ার সুরে ভর করিয়া ছেলের মন চলিয়া গেল ছড়ার মধ্যেকার ছবির দেশে। দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ ঘুমে জড়াইয়া আসিল। সে ঘুমাইয়া পড়িল।

এইরকম শত শত ছড়া আমাদের দেশের মেয়েদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই ছড়াগুলি কবে কাহারা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার সন-তারিখ কেহ লিখিয়া রাখে নাই, কেহ জানেও না। তবু এগুলি চমৎকার এবং চিরনূতন।

ছড়াগুলিতে ভাব এলোমেলো,—কিন্তু অজস্র ছবি আছে। আর আছে শব্দের অপরূপ ধ্বনিমাধুর্য্য। উহাই মোহমন্ত্রের কাজ করে। দুরন্ত অস্থির ছেলেকেও মুহূর্ত্তে এক স্বপ্নের রাজ্যে লইয়া যায়।

ব্রতকথা

লোকসাহিত্যের অন্যতম সম্পদ্ ছড়ার পরেই ব্রতকথার কথা বলিতে হয়। ব্রত বিশেষভাবেই মেয়েদের ব্যাপার। তাই মেয়েদের নানারকম কামনা-বাসনা ব্রতকথায় ছন্দে গানে প্রকাশ পাইয়াছে। পুণ্যিপুকুর, বসুধারা, ষষ্ঠী,

ইতু, ভাদু, তুষতুষুলি—কতরকম ব্রত যে বাঙ্গালী মেয়েদের মধ্যে চলিত আছে, তাহার আর সীমাসংখ্যা নাই।

ব্রতের প্রধান অঙ্গ ছড়া-কাটা, অনুষ্ঠান আর আল্পনা। ব্রতের ছড়া ধ্বনিগুণে গানের মত বাজিয়া উঠে। "আমাদের রায়ের বিয়ে, ঝামকুড়কুড় দিয়ে,"—এই কয়েকটি কথায় সূর্য্যদেবের বরযাত্রার বাদ্য কেমন বাজিয়া উঠিয়াছে! ভাই-বোন্, শ্বশুর-শাশুড়ী অথবা স্বামীপুত্রের মঙ্গলকামনাও অনেক ব্রতের ছড়ার বিষয়। আবার সংসারের শ্রী ও সম্পদের কামনাও অনেক ব্রতের ছড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন—

এস পৌষ যেও না—
ভাতের হাঁড়িতে থাক পৌষ, যেও না।
লেপ কাঁথায় থাক পৌষ, যেও না,
পোয়াল গাদায় থাক পৌষ, যেও না,
পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস, যেও না।

কবি সঙ্গীত

বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য আর আধুনিক কাব্যসাহিত্য—এই দুইয়ের মাঝখানে লোকসাহিত্যের আর একটি শাখা প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাহাই কবিসঙ্গীত বা কবিওয়ালার গান নামে বিখ্যাত। এগুলিতে ভাবের গাঢ়তা অথবা গঠনের পারিপাট্য ছিল না, এগুলি মানুষের মধ্যে কোনো ধর্ম্মভাব জাগাইতে পারিত না,—রাজারাজড়াকে খুশী করিবার জন্যও এগুলি রচনা করা হয় নাই। কেবল সাধারণের অবসর-বিনোদনের জন্য গান রচনা এই কবিওয়ালারাই বাংলাদেশে প্রথম করেন। সাধারণের অবসর-রঞ্জনের জন্য কথার কৌশল, অনুপ্রাসের ছটা ছাড়া আর কোনো পথই নাই। তাই ইঁহারা সেই প্রয়াসই করিয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়।

কবিসঙ্গীতে অনুপ্রাসের ঘটা থাকিলেও সেগুলির মধ্যে মাঝে মাঝে পৌরাণিক কাহিনীর উল্লেখ বা ইঙ্গিত থাকিত। এই সূত্রে জনসাধারণ শুধু আনন্দ নয়, পুরাণ সম্বন্ধে শিক্ষাও লাভ করিতে সমর্থ হইত।

ভাটিয়ালী গান

সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। দিনের শেষে চাষী লাঙ্গল কাঁধে লইয়া, আর রাখাল গরু লইয়া ঘরে ফিরিতেছে। মাঝি খেয়া পারাপার করিতেছে, কিংবা দূরপাল্লায় পাড়ি দিতেছে। তখন তাহাদের কণ্ঠে এই ভাটিয়ালী গান শুনা যায়। এ গানের বিষয় নানাবিধ,—ইহার সুর মানুষের মনকে উদাস করিয়া কোন্ এক অজানালোকে যেন লইয়া যায়।

বাউল গান

একটি বিশেষ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকদের বাউল বলে। ইহাদের গান বাউল সঙ্গীত নামে বাংলায় বিখ্যাত। বাউল গানগুলিও বাংলার লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ্।

সহজভাবে জীবনযাপন ও ধর্ম্মসাধন করাই বাউলদের উদ্দেশ্য। তাহারা নিজেদের বিবেচনা অনুযায়ী সংসারে চলিয়া থাকে। কোন প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস বা অন্ধসংস্কার তাহাদের নাই। তাই গান করে—

তাইতে বাউল হইনু ভাই।
এখন লোকের বেদের ভেদবিভেদের
আর তো দাবী দাওয়া নাই।

ইঁহাদের মতে প্রতিমাপূজা, উপবাস, ব্রতনিয়ম, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির কোন আবশ্যক নাই। ইঁহারা বলেন পরমদেবতার মূর্ত্তি এই নরদেহের মধ্যেই বিরাজ করিতেছে, তাঁহাকে অন্যত্র অনুসন্ধান করিবার আবশ্যক নাই, মন্দিরে বা তীর্থে তাঁহার সন্ধান করিয়া ফেরা নিরর্থক।

কারে বল্‌ব, কে করবে বা প্রত্যয়।
আছে এই মানুষে সত্য নিত্য চিদানন্দময়॥

লালন ফকির নামে একজন বাউল কবি বলিয়াছেন,—

আছে আদ মক্কা এই মানব দেহে,
দেখনা রে মন চেয়ে।
দেশ-দেশান্তর দৌড়িয়ে এবার
মরিস কেন হাঁপিয়ে ?

এবং—

যারে আকাশ-পাতাল খুঁজে মরিস,
এই দেহে সে রয়।

এইরূপে নানাভাবের গান রচনা করিয়া বাউল সাধকেরা মানুষকে উদার শিক্ষাই দিয়া থাকেন। ইঁহাদের শিক্ষায় কোন সঙ্কীর্ণতা নাই। গানই তাঁহাদের শাস্ত্র। গানগুলিতে মনের সহজ অনুভূতি, সহজ সত্য এবং শাশ্বত মানব-ধর্ম্মের অনুপম উপলব্ধির কথা অসাধারণ উচ্চ কবিত্বময় ভাষায় প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছে। যেমন—

১। ধন্য আমি—বাঁশীতে তোর
আপন মনের ফুঁক।
এক বাজনে ফুরাই যদি
নাই রে কোনো দুখ॥
ত্রিলোকধাম তোমার বাঁশী,
আমি তোমার ফুঁক।
ভাল মন্দ রন্ধ্রে বাজি,
বাজি সুখ আর দুখ॥
সকাল বাজি, সন্ধ্যা বাজি,
বাজি নিশুইত রাত।

ফাগুন বাজি, শাঙন বাজি
তোমার মনের সাথ॥
একবারেই ফুরাই যদি
কোনো দুঃখ নাই।
এমন সুরে গেলাম বাইজা
আর কি আমি চাই॥

২। আকাশের গায়ে আলো ফুটেছে,
এবার দয়াল ফুটেছে আখীর[১],
আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখি
দয়াল আমার সমুখে জাহির,
রে সম্মুখে জাহির।
ফুল ঝরে, পাখী উড়ে, পাতার শিশির,
গলে রে রোদের তাপে আলোক নিশির,
দয়াল আলোক শশীর।
তাই ভেবে কান্দে ঈশান,[২] যাতনা গভীর,
বড় যাতনা গভীর॥

—ঈশান ফকির

৩। তোমার পথ ঢেক্যাছে মন্দিরে মসজিদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চল্‌তে না পাই,—
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে[৩]॥
ওরে প্রেম দুয়ারে নানান্ তালা—
পুরাণ কোরাণ তসবী[৪] মালা,
হায় গুরু এই বিষম জ্বালা!

—সেখ মদন বাউল

১। অবশেষে। ২। উষার আভাস মিলাইয়া যাইতে দেখিয়া।
৩। ধর্মোপদেষ্টা। ৪। জপমালা।

ছড়া, ব্রতকথার কবিদিগের নাম পাওয়া যায় নাই। কিন্তু কোন কোন বাউলসঙ্গীত-রচয়িতা কবির নাম পাওয়া গিয়াছে। বাউল গানের অনেক মুসলমান রচয়িতাও পাওয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা, মুর্শিদা গান, মাণিকপীর, সত্যপীরের গান—এ সকলও বাংলার লোকসাহিত্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী। এগুলিতেও আনন্দ ও শিক্ষার চমৎকার সমন্বয় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

পল্লী-গীতিকা

ময়মনসিংহ গীতিকা, পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা নামে অনেকগুলি গাথা ময়মনসিংহ প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী-অঞ্চল হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। সে সকলই পল্লী-কবিদের দ্বারা রচিত। সেগুলি পল্লী-কবির অন্তরের অকৃত্রিম আনন্দ-বেদনার প্রকাশ। পাণ্ডিত্য অথবা সংস্কৃত রীতি-অনুসারী বর্ণনাভঙ্গী বা অলঙ্কারপ্রয়োগ-পদ্ধতির দ্বারা ঐ সকল গীতিকা কণ্টকিত হয় নাই। বিশেষতঃ এই সকল গীতিকার গল্পগুলিতে বাংলার মাটির একটা চিত্তাকর্ষক আঘ্রাণ আছে। ভাদ্র মাসে কেয়া, কুন্দ এবং কদম্ব ; বসন্তকালে মালতী, জবা, নবমল্লিকা ; শরৎকালে কুমুদ-কহ্লার ও পদ্ম প্রভৃতি চিরপরিচিত ফুলের গন্ধ ও সৌন্দর্য্যে আমরা বুঝিতে পারি যে, কবিগণ বাংলার কথাই বলিতেছেন। গল্পগুলির সর্ব্বত্রই খালবিল, গাংচিল ; কেয়াবন ও নীপবৃক্ষ।

ঐ সকল গীতিকার গল্পাংশের মধ্যে ইতিহাস আছে, পুরাণ আছে, ধর্ম্মতত্ত্ব আছে। দর্শন আছে, সমাজচিত্র এবং সমাজতত্ত্বও আছে। ভাষাতত্ত্বের দিক দিয়াও এই সকল গীতিকার মূল্য আছে। কিন্তু ইহাদের মূল্য খাঁটি কবিত্ব-রসে,—সমাজের অতি সাধারণ মানবমনের সুখদুঃখ-বিশ্লেষণে, অতি সাধারণ নগণ্য মানুষের দুঃখের প্রতি দরদে। এই পল্লী-গীতিকাগুলি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"বাংলা প্রাচীন সাহিত্যে মঙ্গলগান প্রভৃতি কাব্যগুলি ধনীদের ফরমাসে ও খরচে খনন করা পুষ্করিণী, কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকা

বাংলার পল্লী-হৃদয়ের গভীর স্তর থেকে স্বতঃ-উচ্ছ্বসিত উৎস, অকৃত্রিম বেদনার স্বচ্ছ ধারা।" কবির এ উক্তি সত্য—সত্যই সাধারণ পল্লীবাসীর জীবনের ঘটনায় ভরা এই গীতিকাগুলি। তাই এগুলি বড়ই মর্ম্মস্পর্শী।

ময়মনসিংহ গীতিকা প্রভৃতি পল্লী-গীতিকাগুলির বিশেষত্ব এই যে, অপরাপর পুরাতন গীতিকথার মত, অথবা মঙ্গলকাব্যের মত এগুলির গল্পাংশ কোন পুরাণ হইতে গৃহীত হয় নাই,—রাজা-রাজড়া অথবা সমাজের অভিজাত শ্রেণীর আনন্দ-বেদনার কাহিনীও এগুলি নয়। কৃত্তিবাসের রামায়ণের মত, কবীন্দ্র পরমেশ্বরের মহাভারতের মত, অথবা মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের মত কোনো রাজার আদেশেও এইসব পল্লী-গীতিকা রচিত হয় নাই। ইহার আখ্যায়িকাগুলি সম্পূর্ণ নূতন এবং সেকালের অতিসাধারণ নরনারীর দৈনন্দিন জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই এই পল্লী-গীতিকাগুলির মধ্যে মঙ্গলকাব্যসুলভ অলৌকিকতা নাই। এগুলির মধ্যে বাস্তবজীবনের স্বরূপই স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবজীবনের হাসিকান্না ইহাদের উপজীব্য। এইসব গীতিকার নায়ক-নায়িকা সামান্য সাধারণ মানুষ। এগুলিতে সাধারণ সমাজ-চিত্র আছে। সেইজন্য সকল কাহিনীই আমাদের সহানুভূতি উদ্রেক করে।

বৈষ্ণব কবিতার অপরূপ আধ্যাত্মিকতা অথবা অতীন্দ্রিয়তার কথা এই সকল গীতিকায় নাই বটে; কিন্তু বাংলার পল্লী-গীতিকার প্রধান আকর্ষণ ইহাদের পরিপূর্ণ আন্তরিকতায়। এ সকল গীতিকার বর্ণনা বাহুল্যবর্জ্জিত। বলিবার ভঙ্গীটি এবং ভাষা সরস সজীব। ইহার অলঙ্কার সংস্কৃতের কাছ হইতে ধার করা নহে—গ্রাম্য-কবিদের নিজেদের উদ্ভাবন। খুঁটিনাটি দেখিবার ক্ষমতা, মনের ভাব অনুভব করিবার শক্তি এবং বাস্তবতার সহিত কল্পনার এক অপরূপ সংমিশ্রণ—ইহাই এইসকল পল্লী-গীতিকার বিশেষত্ব।

এসকল পল্লী-গীতিকার আর একটি বিশেষত্ব—এগুলিতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির পরিচয় আছে। গীতিকাগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেদের নায়ক করা হইয়াছে,—তাহাদের কথা সহানুভূতির সঙ্গে বলা হইয়াছে। অতএব ইহাকে বাংলাদেশের অন্তরের সাহিত্য বলা যাইতে পারে।

এই সকল পল্লী-গীতিকা-রচয়িতা কবির মধ্যে কয়েকজনের নাম কাব্য-গুলির মধ্য হইতেই পাওয়া গিয়াছে। বাকী অনেক গীতিকার রচয়িতাই অজ্ঞাতনামা গ্রাম্য-কবি। যে কয়জনের নাম জানা গিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য দ্বিজ কানাই, নয়নচাঁদ ঘোষ, দ্বিজ ঈশান, রঘুসুত প্রভৃতি কয়েকজন কবি। কয়েকজন মুসলমান কবির লেখা পল্লী-গীতিকাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে নাম করা যাইতে পারে—ফকির ফৈজু, মনসুর বয়াতি প্রভৃতির। বর্ণনার ঐশ্বর্য্যে ঐসকল গীতিকাও অপূর্ব্ব। রামায়ণ-রচয়িতা মহিলা কবি চন্দ্রাবতী "কেনারাম" নামে একটি পল্লী-গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাও আন্তরিকতায় ও সরল সৌন্দর্য্যে সমুজ্জ্বল।

ভারতচন্দ্র

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য রচনার যে ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, মধ্যযুগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত ঐ ধারাই অনুসৃত হইয়া আসিয়াছিল। মধ্যযুগের শেষভাগের কবি ভারতচন্দ্র। তিনিও মঙ্গলকাব্য রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার বিখ্যাত রচনা অন্নদামঙ্গল কাব্য। এই কাব্যে দেবী অন্নপূর্ণার মহিমার কথা বলা হইয়াছে।

কাব্যখানি তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মত দেবদেবীর বন্দনা, দক্ষযজ্ঞের কথা, শিব-বিবাহের কথা, ব্যাসের কাশী-নির্ম্মাণ প্রভৃতি পুরাণের অনেক বিষয় ও কাহিনীর বর্ণনা। দ্বিতীয় ভাগে বিদ্যাসুন্দর। যে বিদ্যাসুন্দর রচনার জন্য ভারতচন্দ্রের যশ এককালে সমস্ত বাংলাদেশে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই বিদ্যাসুন্দর কাহিনী "অন্নদামঙ্গল" কাব্যেরই অঙ্গ,—ইহারই মধ্যবর্ত্তী এক উপাখ্যান। এককালে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা প্রভৃতিতে গান করা হইত। অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় অংশের নাম 'মানসিংহ'। এই অংশে মানসিংহের যশোহর-জয়ের কথা বর্ণনা করা হইয়াছে।

অন্নদামঙ্গল কাব্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন যে উহা—"রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য্য।"—বাস্তবিক, ছন্দের বৈচিত্র্যে, শব্দের ঐশ্বর্য্যে, ভাষার কারুকার্য্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য রত্নমালার মতই উজ্জ্বল। ইহার আগাগোড়া মাজা-ঘষা পরিষ্কার করা। প্রত্যেকটি পংক্তিতে কবি যেন নিটোল মুক্তার সারি সাজাইয়া রাখিয়াছেন!

অন্নদামঙ্গলের কবি জমিদারের ছেলে ছিলেন। হাবড়া-আমতার নিকটে পেঁড়ো-বসন্তপুর গ্রামে তাঁহার জন্ম। সেখানকার জমিদার নরেন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁহার পিতা। তাঁহার পিতার সহিত একবার বর্দ্ধমানের রাণীর বিবাদ হয়। সেই বিবাদের ফলে তাঁহার সমস্ত পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং নানারকম দুর্ভাগ্যের মধ্য দিয়া কবিকে জীবনস্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতে হয়। প্রথম জীবনে কবিকে বহু কষ্টের মধ্যেই দিন কাটাইতে হইয়াছিল।

ভারতচন্দ্রের বয়স তখন চৌদ্দ কি পনর হইবে। উহার মধ্যেই অনেক ভাগ্যবিড়ম্বনা তাঁহার ঘটিয়াছিল। অবশেষে পনের বৎসর বয়সের সময়ে হুগলী জেলার দেবানন্দপুরের মুন্সীবাড়ীতে তিনি আশ্রয় পান। এইখানেই একদিন ভারতচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বিকাশ দেখা গিয়াছিল।

সেদিন দেবানন্দপুরের ঐ মুন্সীবাড়ীতে সত্যনারায়ণের পূজা হইবে। ব্রতকথার পুঁথি পড়িবার ভার দেওয়া হইল ব্রাহ্মণ ভারতচন্দ্রের উপর। কিন্তু পুরান পুঁথি না পড়িয়া তিনি নিজেই সত্যনারায়ণের এক নূতন পাঁচালী রচনা করিয়া পাঠ করিলেন এবং পাঠ-শেষে রচনাকারের নাম বলিতে গিয়া নিজের নামটাই উচ্চারণ করিলেন। ইহাতে সকল শ্রোতা জানিলেন যে, সেদিনকার পাঁচালীর রচয়িতা ভারতচন্দ্র নিজেই। ভারতচন্দ্রের বয়স তখন পনের।

পনের বৎসরের বালকের রচিত এই পাঁচালী গানের সর্ব্বত্রই তাঁহার ভবিষ্যৎ কবিত্ব-শক্তির পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণেই পাওয়া গিয়াছিল। তাই উহা শুনিয়া সকল শ্রোতা মুগ্ধ হইলেন। সকলেই বুঝিলেন যে ঐ কিশোর বালকের কবিত্বের যশ একদিন সারা বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িবে।

হইয়াছিলও তাহাই,—সেদিনকার সেই বালক ভারতচন্দ্রের নাম বঙ্গসাহিত্যে চিরস্মরণীয় ও অমর হইয়া রহিয়াছে।

দেবানন্দপুরের মুন্সীবাড়ীতে আশ্রয় পাইয়া সাময়িকভাবে ভারতচন্দ্রের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইয়াছিল। কিন্তু তাহা স্থায়ী হয় নাই। কিছুদিন দেবানন্দপুরে থাকার পরে পিতার অনুরোধে তিনি তাঁহাদের জমীদারীর কাজকর্ম্ম দেখিবার জন্য বর্দ্ধমানে যান। কিন্তু বর্দ্ধমানে গিয়া তিনি বর্দ্ধমানরাজের কতকগুলি অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন। ফলে বর্দ্ধমানরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। কবির ভাগ্যাকাশে আবার দুঃখের কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিল।

কিন্তু অল্পদিন পরেই তিনি কারাধ্যক্ষের অনুগ্রহে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করেন এবং পুরীর রাজা শিবভট্টের আশ্রয়ে বাস করিতে থাকেন। ইহার পরে তিনি সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে নানা তীর্থ পর্য্যটন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঘুরিতে ঘুরিতে ভাগ্যহীন কবি কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানকার জমিদার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সংস্পর্শে আসিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন—বহুদিন পরে কবির জীবনে আবার আলোকরেখা দেখা দিল। আবার তাঁহার সৌভাগ্যের পথ উন্মুক্ত হইল।

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও গুণীর আদর করিতে জানিতেন। তাঁহার রাজসভায় অনেক বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন সত্য, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মত কবির সে সভায় একান্ত অভাব ছিল। তাই বিপন্ন আশ্রয়হীন ভারতচন্দ্রকে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পরম সমাদরের সহিত তাঁহার সভাকবি হিসাবে বরণ করিলেন। রাজসরকার হইতে বৃত্তি পাইয়া এবং রাজার আশ্রয় লাভ করিয়া ভারতচন্দ্রের ভাগ্য ফিরিল। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে একখানি কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহার নাম "কালিকামঙ্গল"।

"কালিকামঙ্গলে" কালিকা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল—শাক্ত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র খুশী হইলেন। ইহার পরে ভারতচন্দ্র তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করেন এবং ঐ অন্নদামঙ্গলের মধ্যে "কালিকামঙ্গল" কাব্যের বহু অংশ কাটিয়া-ছাঁটিয়া, মাজিয়া-ঘষিয়া, পরিবর্ত্তন ও সংশোধন করিয়া তিনি ঢুকাইয়া দেন।

এই "কালিকামঙ্গল" ও "অন্নদামঙ্গল" কাব্য দুইখানি শ্রবণ করিয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের কবিত্বে চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে "কবিগুণাকর" উপাধিতে ভূষিত করিলেন। "কবিকঙ্কণ" বলিতে যেমন চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরামকে বুঝায়, "কবিগুণাকর" বলিলেও তেমনি অন্নদামঙ্গলের কবি ভারতচন্দ্রকেই বুঝায়। ভারতচন্দ্র বহু গ্রন্থ ও কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

ভারতচন্দ্র মধ্য-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। শব্দবিন্যাস, ভাবপ্রকাশ ও ছন্দ-সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ কোন মঙ্গলকাব্যরচয়িতা কবি তাঁহার পূর্ব্বে বা পরে বঙ্গসাহিত্যে আবির্ভূত হন নাই।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে যত প্রকার ছন্দ আছে সেই সকল ছন্দের প্রায় সকলগুলির আদর্শে ভারতচন্দ্র নূতন নূতন বাংলা ছন্দ উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং সেই সকল ছন্দ তাঁহার অমর কাব্য অন্নদামঙ্গলের স্থানে স্থানে ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে বাংলা ভাষার ছন্দসম্পদ বাড়িয়াছিল, বাংলার ছন্দোবৈচিত্র্য ঘটিয়াছিল।

শুধু নূতন নূতন ছন্দ উদ্ভাবনে নয়, ভাব অনুযায়ী ভাষার প্রয়োগে এবং মধুর শব্দসমাবেশের দ্বারা মধুর ছন্দ-স্পন্দের সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যের অনেকস্থলে কেবল ছন্দ ও শব্দের মাধুর্য্যে এক একটি মূর্ত্তি নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। যেমন,—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে।
ভভম্ভম্ ভভম্ভম্ শিঙ্গা ঘোর বাজে॥
লটাপট জটাজূট সংঘট্ট গঙ্গা।
ছলচ্ছল-টলট্টল-কলক্কল তরঙ্গা॥

ফণাফণ ফণাফণ ফণীফণ্ন গাজে।
দিনেশ-প্রতাপে নিশানাথ সাজে ॥
ধকধ্বক ধকধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে।
ববম্বম্ ববম্বম্ মহাশব্দ গালে ॥
দলম্মল দলম্মল গলে মুণ্ডমালা।
কটিকট্ট সদ্যোমরা হস্তী-ছালা ॥
পচাচর্ম্ম ঝুলি করে লোল ঝুলে।
মহা ঘোর আভা পিনাকে-ত্রিশূলে ॥
ধিয়া তাধিয়া তাধিয়া ভূত নাচে।
উলঙ্গী উলঙ্গে পিশাচী-পিশাচে ॥
*　　*　　*　　*　　*
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে।
অরে রে, অরে দক্ষ, দে রে সতীরে ॥

ইহা মহাদেবের ভৈরব মূর্ত্তির বর্ণনা। শুধুমাত্র ভাষা ও ছন্দের সাহায্যে এইরূপে বর্ণনীয় বস্তুর রূপকে বা ছবিকে চাক্ষুষ করিবার কৌশল ভারতচন্দ্রের মত মধ্যযুগের অন্য কোন কবির আয়ত্ত ছিল না।

শ্রুতিসুখকর শব্দের পসরা সাজাইয়াও রচনাকে মাধুর্য্যমণ্ডিত করিতে ভারতচন্দ্রের মত মধ্যযুগের অন্য কোন কবি পারেন নাই। যেমন,—

(১) কল কোকিল অলিকুল বকুল-ফুলে।
বসিলা অন্নপূর্ণা মণি-দেউলে ॥
কমল-পরিমল লয়ে শীতল জল, পবনে ঢলঢল উছলে কূলে।
বসন্ত রাজা আনি, ছয় রাগিণী রাণী, করিলা রাজধানী অশোকমূলে ॥
কুসুমে পুনঃ পুনঃ, ভ্রমর গুণগুণ, মদন দিলা গুণ ধনুক-হুলে।
যতেক উপবন, কুসুম সুশোভন, মধু-মুদিত মন ভারত ভুলে ॥

অথবা—

(২) জয় কৃষ্ণ-কেশব　　রাম রাঘব
কংসদানব-ঘাতন।

জয় পদ্মলোচন নন্দ-নন্দন
কুন্দকানন রঞ্জন ॥
জয় কেশিমর্দ্দন কৈটভার্দ্দন
গোপিকাগণমোহন।
জয় গোপবালক বৎসপালক
পূতনা বক-নাশন ॥

এই সকল বর্ণনার শব্দমন্ত্র এমনই হৃদয়গ্রাহী যে, উহা যেন সঙ্গীতের মত কর্ণে সুধাবর্ষণ করে। শব্দের ঘাত-প্রতিঘাতে, একই বর্ণের পুনরাবৃত্তিতে এই সকল অংশে চমৎকার একটা ঝঙ্কার তরঙ্গিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শেষের অংশটিতে সংস্কৃত ও বাংলা শব্দ পাশাপাশি বসিয়া মিলিয়া মিশিয়া স্বাভাবিকভাবে একাকার হইয়া গিয়াছে।

রামপ্রসাদ

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের শেষ ভাগে ভারতচন্দ্র ছাড়া আর একজন ক্ষমতাশালী কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন রামপ্রসাদ সেন। ইনিই শ্যামাসঙ্গীতের আদি কবি—আগমনী ও বিজয়া গানও বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম রামপ্রসাদই রচনা করেন। এখনও বাংলার পথে-ঘাটে, ভিখারী বাউলের মুখে, মাঝি-মাল্লার কণ্ঠে রামপ্রসাদী-গান শুনা যায়। আমাদের দেশের নিরক্ষরেরাও রামপ্রসাদের নাম করিলেই তাঁহাকে চিনিতে পারে—এমনই তাঁহার জনপ্রিয়তা।

কলিকাতার নিকটে গঙ্গাতীরে হালিশহর নামে একখানি বড় গ্রাম। তাহারই পার্শ্বে কুমারহট্ট নামে পল্লী। সেই পল্লীতে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের পিতার নাম ছিল রামরাম সেন। বাল্যকালেই রামপ্রসাদ পিতৃহীন হন।

এই কারণে অতি অল্প বয়সেই রামপ্রসাদকে অর্থোপার্জ্জনের জন্য চাকুরী গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কলিকাতার এক ধনবান্ গৃহস্থের বাড়ীতে তিনি

মুহুরীগিরির কাজ লইয়াছিলেন। কিন্তু ভাবুক কবি হিসাবের খাতার মধ্যেই মাঝে মাঝে আবেগবশে কবিতা লিখিয়া খাতা ভরিতে লাগিলেন।

সেদিন সকাল হইয়াছে। রামপ্রসাদের ধনী মনিব কাছারীতে আসিয়া বসিয়াছেন। এমন সময় রামপ্রসাদের এক উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী হিসাবের খাতা আনিয়া চোখ পাকাইয়া মনিবকে দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখুন হুজুর! আপনার নতুন কর্ম্মচারীর কাণ্ড। কাজকর্ম্ম হিসেব-নিকেশের বালাই নেই! হিসেবের খাতায় কবিতা লেখা হয়েছে!"

রামপ্রসাদের মনিব খাতাখানি খুলিয়া দেখিলেন যে নালিশ সত্য। খাতাখানির মধ্যে সত্যসত্যই হিসাব ও কবিতায় জট পাকাইয়া গিয়াছে। এক জায়গায় পড়িলেন,—লেখা রহিয়াছে—

আমায় দে মা ত'বিলদারী
আমি নেমকহারাম নই শঙ্করী!

ইহা পড়িয়া ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, জমীদার মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং রামপ্রসাদকে ডাকিয়া বলিলেন, "কবিতা লিখিয়া তুমি আমার হিসাবের খাতা নষ্ট কর নাই। বরং তোমার ভক্তির আবেগবশে লেখা কবিতার দ্বারা আমার খাতা পবিত্র হইয়াছে। তুমি এখন গৃহে যাও, আর তোমার কাজ করিবার দরকার নাই, ঘরে বসিয়া তুমি আমার কাছ হইতে মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করিয়া পাইবে।"

কবি তখন নিজের গ্রামে ফিরিয়া গিয়া নিশ্চিন্তমনে কালীর সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করিলেন।

সেই সময়ে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারও রামপ্রসাদের কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া কবিকে একশত বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন, এবং তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি দেন। বাংলার নবাব তখন সিরাজউদ্দৌলা। তিনিও রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া কবিকে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

কুমারহট্ট গ্রাম। গ্রামখানির পাশ দিয়া গঙ্গানদী তরতর করিয়া বহিয়া যাইতেছে। নদীর জলে নামিয়া রামপ্রসাদ স্নান করিতেছেন আর আপন মনে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেছেন। বাতাসে সেই গানের রাগিণী ছড়াইয়া পড়িয়া চারিদিক মাতাইয়া তুলিয়াছে।

এমনি সময়ে নদীবক্ষ দিয়া কয়েকখানি বজরা ভাসিয়া যাইতেছিল। সমস্ত বজরাই নবাব সিরাজউদ্দৌলার—উহাদের একখানির মধ্যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা স্বয়ং ছিলেন।

হঠাৎ নদীর মাঝখানে সিরাজের বজরা থামিল। তিনি আদেশ দিলেন, "ঐ সাধককে বজরায় লইয়া আইস। আমি উহার গান শুনিব। এমন সুরের গান ত কখনও শুনি নাই!"

নবাবের আদেশে নবাবের অনুচরেরা নৌকা লইয়া আসিয়া রামপ্রসাদকে অভ্যর্থনা করিয়া নবাবের বজরায় লইয়া গেল।

রামপ্রসাদ ভাবিলেন যে, নবাব যখন তাঁহার গান শুনিতে চাহিতেছেন তখন তাঁহাকে গোটাকয়েক উর্দ্দু গান শুনাইয়া দেওয়া যাউক। বাংলা গান ত' আর নবাবের ভাল লাগিতে পারে না—বিশেষ আবার শ্যামাসঙ্গীত!

রামপ্রসাদ উর্দ্দু গান গাহিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে গান শুনিয়া নবাবের তৃপ্তি হইল না। তিনি যে রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতের সুরে আকৃষ্ট হইয়াই সেখানে বজরা থামাইয়াছিলেন! যিনি একবার শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়াছেন, তিনি কি আর অন্য কোন গান শুনিয়া খুশী হইতে পারেন! তাই নবাব রামপ্রসাদের উর্দ্দু গান থামাইয়া বলিলেন, "আপনি জলে দাঁড়াইয়া যে গান গাহিতেছিলেন, সেই গান আমায় শুনান। অন্য কোন গান শুনিবার সখ আমার নাই।"

রামপ্রসাদ শ্যামাসঙ্গীত ধরিলেন। বড় দরদ দিয়াই তিনি খানকয়েক শ্যামাসঙ্গীত গাহিলেন। সে গান শুনিয়া নবাবের মন-প্রাণ আনন্দে আকুল হইয়া উঠিল। মুগ্ধ নবাব রামপ্রসাদকে পুরস্কার দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

রামপ্রসাদী শ্যামাসঙ্গীত এবং আগমনী ও বিজয়া গান বাংলা সাহিত্যের গৌরব। এমন গান ভারতের আর কোন প্রদেশে নাই, ভারতের আর কোন প্রদেশের লোকেরা এমন গান গাহিতেও জানে না।

রামপ্রসাদী গানের বিশেষত্ব ও মাধুর্য্য উহার সুরের মনোহারিত্বে ও ভাবের বৈশিষ্ট্যে। শ্যামাসঙ্গীতে দেবী শ্যামা স্নেহময়ী মাতারূপে কল্পিতা; আর আগমনী ও বিজয়া গানে দেবী দুর্গাকে কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। রামপ্রসাদী গান শুধু দেবীর প্রতি ভক্তির কথায় পরিপূর্ণ নহে। শ্যামাসঙ্গীতে এবং আগমনী ও বিজয়া গানে কবি শ্যামা এবং উমার সহিত ভক্তের এক মধুর সম্বন্ধ পাতাইয়াছেন—সে সম্বন্ধ স্নেহের সম্বন্ধ।

সরল শিশু যেমন তাহার মাতার প্রতি ভক্তিমিশ্রিত ভাব লইয়া আদর-আব্দার প্রকাশ করে, রামপ্রসাদের গানেও সেইরূপ ভক্তি ও সরলতার সমন্বয়। তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতে তিনি কখনও দেবীর সহিত পরিহাস করিয়াছেন, কখনও কলহ করিয়াছেন,—কখনও আব্দারে ছেলের মত মায়ের কাছে স্নেহের দাবীটুকু বা তাঁহার প্রার্থনা জানাইয়াছেন। আবার কখনও মায়ের প্রতি অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন, মাকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু সেই গালি কপট,—উহা স্নেহ ভক্তি ও আত্মসমর্পণের কথায় পরিপূর্ণ। যেমন—

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী),
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা
দুইটার একটা করে যাব।
তোর মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে মা
অম্বলে সম্বল চড়াব॥
হাতে কালী মুখে কালী (মা)
সর্ব্বাঙ্গে কালী মাখিব।

যখন আসবে শমন ধরবে চুলে
সেই কালী তোর মুখে দিব ॥
খাব খাব বলি মাগো উদরস্থ না করিব ;
এই হৃদিপদ্মে বসাইয়ে মনোমানসে পূজিব ॥

রামপ্রসাদের লেখা এইরূপ আদর-আব্‌দার এবং অভিমানে পরিপূর্ণ গান আরও অনেক আছে।—

(১) মা আমায় ঘুরাবি কত ?
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ॥
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত।
তুমি কি দোষে করিলে আমায়,
ছটা কলুর* অনুগত ॥
মা শব্দ মমতাযুত,
কাঁদলে কোলে করে সুত।
দেখি ব্রহ্মাণ্ডেরই এই রীতি মা
আমি কি মা ছাড়া জগত ॥
দুর্গা দুর্গা বলে, তরে গেল পাপী কত।
একবার খুলে দে চক্ষের ঠুলি,
দেখি শ্রীপদ মনের মত ॥

(২) মা মা বলে আর ডাকব না।
ও মা, দিয়েছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা ॥
ছিলেম গৃহবাসী বানালে সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখ এলোকেশী,

* কবি এখানে কাম-ক্রোধাদি ছয় রিপুকে "ছটা কলু' বলিতেছেন। ভগবান মানুষকে ছয় রিপুর অধীন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন —তাই কবির অনুযোগ।

ঘরে ঘরে যাব ভিক্ষা মেগে খাব,
মা বলে আর কোলে যাব না ॥
ডাকি বারে বারে মা মা বলিয়ে,
মা কি রয়েছ চক্ষুকর্ণ খেয়ে,
মা বিদ্যমানে, এ দুঃখ সন্তানে,
মা মলে কি আর ছেলে বাঁচে না!
ভণে রামপ্রসাদ মায়ের কি এ সূত্র,
মা হয়ে হলি মা সন্তানের শত্রু ;
দিবানিশি ভাবি আর কি করিবি
দিবি দিবি পুন জঠর-যন্ত্রণা ॥

রামপ্রসাদের মধ্যে একটা উদার আধ্যাত্মিকতা ছিল। তাই মূর্ত্তিপূজার অসারতা, ডাকের গহনা দিয়া মা'কে সাজান, অথবা বিশ্বপালয়িত্রী অন্নদাত্রী দেবীকে আলোচাল প্রভৃতির নৈবেদ্য দিয়া তুষ্ট করা তাঁহার কাছে অর্থহীন ঠেকিয়াছিল। তাই তিনি বলিয়াছেন—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না ॥
ওরে ত্রিভুবন সে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি তাই জানো না।
কোন্ প্রাণে তাঁর মাটির মূর্ত্তি,
গড়িয়ে করিস উপাসনা ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা
দিয়ে কত রত্ন-সোনা।
ওরে, কোন লাজে সাজাতে চাস তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়,
আলোচাল আর বুট ভিজানা॥
জগৎকে পালিছেন যে মা
পশুপক্ষী কীট নানা,—
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ-মহিষ আর ছাগলছানা॥

প্রথম জীবন হইতেই রামপ্রসাদ ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন এবং তাঁহার ঐকান্তিক ভক্তিতে প্রীত হইয়া জগন্মাতা যে তাঁহাকে একবার সশরীরে দেখা দিয়াছিলেন, সেই অলৌকিক কাহিনীটি বাংলাদেশে আজিও প্রচলিত আছে।

একদিন রামপ্রসাদ ঘরের বেড়া বাঁধিতেছিলেন। বেড়ার অন্য পাশ হইতে তাঁহার কন্যা তাঁহাকে দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিল। কিছুক্ষণ ঐভাবে দড়ি ফিরাইয়া দিয়া তাঁহার কন্যা গৃহকাজে চলিয়া যায়। কন্যা যে কখন চলিয়া গিয়াছে তাহা রামপ্রসাদ লক্ষ্যও করেন নাই। তিনি একমনে বেড়া বাঁধিতেছিলেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বেড়ার অপর পাশ হইতে তাঁহার কন্যারই মত কে একজন দড়ি ফিরাইয়া দিয়া রামপ্রসাদকে সাহায্য করিতেছিল।

বেড়া বাঁধা শেষ হইয়া গেল। রামপ্রসাদ উঠিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার কন্যা সেখানে ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা! তোমার কি বেড়া বাঁধা শেষ হইয়া গিয়াছে? কিন্তু দড়ি ফিরাইয়া দিল কে?"

রামপ্রসাদ তাঁহার কন্যার কথায় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "কেন তুমিই ত দড়ি ফিরাইয়া দিতেছিলে!"

রামপ্রসাদের কথা শুনিয়া তাঁহার কন্যা বলিল, "কৈ না বাবা! আমি ত খানিকক্ষণ আগে চলিয়া গিয়াছিলাম,—আমি ত দড়ি ফিরাইয়া দিই নাই!"

এইবার রামপ্রসাদের বিস্ময় আরও বাড়িল। আনন্দে তাঁহার মন অধীর হইল। তিনি ভাবিলেন—তবে কি জগজ্জননী কন্যারূপে আমায় দেখা দিয়া গিয়াছেন ?...আনন্দের আবেগে তিনি তখন গাহিয়া উঠিলেন—

মন কেন মার চরণ ছাড়া।
ও মন ভাব শক্তি, পাবে মুক্তি,
বাঁধ দিয়া ভক্তি দড়া ॥
সময় থাকতে না দেখলে মন,
কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে,
বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া ॥

* * * *

যেই ধ্যানে একমনে
সেই পাবে কালিকা তারা।
বার হয়ে দেখ কন্যারূপে
রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া ॥

রামপ্রসাদ যে তাঁহার আরাধ্যা দেবীকে দর্শন করিতেন এবং সেই সাক্ষাতে যে আনন্দ লাভ করিতেন তাহার কথা তাঁহার অনেক গানেই রহিয়াছে।

শ্যামাসঙ্গীতের মত রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়া গানও অপরূপ। উমা-মেনকাকে লইয়া রামপ্রসাদ বাৎসল্যরসের যে ধারা বাংলা দেশে বহাইয়া দিয়াছিলেন তাহাতে বাংলা-সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি দুইই হইয়াছিল।

বিজয়া ও আগমনী গানে গিরিরাণী মেনকার স্নেহপুত্তলী, অঞ্চলের নিধি বালিকা-কন্যা উমার স্বামিগৃহে যাইবার সময়ের বিচ্ছেদ-দুঃখ ও তাঁহার পুনরাগমন-কালের আশা-আনন্দ প্রকাশ পাইয়াছে।

ভগবতী উমা থাকেন কৈলাসে তাঁহার স্বামিগৃহে। বৎসরান্তে শরৎ ঋতুতে মাত্র তিনদিনের জন্য তিনি পিতৃগৃহে আসেন। কন্যার সহিত দীর্ঘকালের বিচ্ছেদ সহিতে না পারিয়া ব্যাকুল হইয়া মেনকা বলেন—

যাও যাও গিরি আনিতে গৌরী
উমা আমার কত কেঁদেছে।—

গিরিরাজকে জিজ্ঞাসা করেন—

কবে যাবে বল গিরিরাজ
আনিতে গৌরী ?
ব্যাকুল হয়েছে প্রাণ
দেখিতে উমারে হে !

যে সকল গানে কন্যারূপিণী উমাকে ফিরিয়া পাইবার অধীরতা অথবা তাঁহার পিতৃগৃহে আগমনের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাই "আগমনী গান"।

তারপর ভগবতী যখন পিতৃগৃহে আসেন তখন মেনকা তাঁহাকে স্নেহের বাঁধনে বাঁধিয়া চিরদিনের জন্য ঘরে রাখিতে চান, কিন্তু পারেন না। মিলনের আনন্দময় তিনটি দিন স্বপ্নের মত গড়াইয়া যায়। তখন কন্যার সহিত আসন্ন বিচ্ছেদব্যথায় অধীর অন্তঃকরণ বলিয়া উঠে—যেতে নাহি দিব,—বলে—

ওরে নবমী নিশি
না হইও রে অবসান !
তুমি অস্তে গেলে নিশি
অস্তে যাবে উমাশশী
হিমালয় আঁধার করে।
গেলে তুমি দয়াময়ি এ পরাণ যাবে !
উদিলে নির্দ্দয় রবি উদয়-অচলে
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!

কিন্তু এত ব্যাকুলতা সত্ত্বেও মায়ের করুণ প্রার্থনা ব্যর্থ হইয়া যায়—নবমীর নিশি পোহাইয়া আসে বিজয়া দশমী—আসে আনন্দময়ী প্রতিমাকে বিদায় দিবার পালা। তখন চোখের জলে ভাসিয়া উমাকে বিদায় দিতে হয়। কন্যাবিচ্ছেদকাতরা মায়ের অন্তরের এই করুণ রাগিণী বিজয়া-গানের মধ্যে ঝঙ্কৃত হইয়াছে।

রামপ্রসাদ যে শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গান রচনা করিয়াছিলেন তাহা বাংলা সাহিত্যের উত্তরকালের অনেক কবিরই রচনার বিষয় হইয়াছিল। রামপ্রসাদের পরে অনেক কবি শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গান রচনা করিয়া বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করিতে হয়—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, কবিওয়ালা রাম বসু, গোপাল উড়ে, দাশরথি রায়, রামনিধি গুপ্ত প্রভৃতির। আধুনিক কালেও এই শ্যামাসঙ্গীত, আগমনী ও বিজয়া গানের ধারাটিকে মধুসূদন দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি টানিয়া আনিয়াছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিকাল

কবির গান ঃ যাত্রা ঃ পাঁচালী গান ও টপ্পাগান

ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পরবর্ত্তী কয়েক বৎসরে বাংলা সাহিত্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য অথবা কোন সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি হয় নাই। এই যুগটিকে বাংলা সাহিত্যের যুগসন্ধিকাল বলা হয়। বাংলার প্রাচীন সাহিত্য আর আধুনিক সাহিত্যের মাঝখানে এই যুগ। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদে প্রাচীন যুগের শেষ, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক যুগের আরম্ভ। এই প্রাচীন ও আধুনিক যুগের মাঝখানে কবির দলের গান খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। কবির দলের গান বহুকাল ধরিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্য-রস-পিপাসা মিটাইয়াছিল।

কবির গানে দুটি দল থাকে। এক দল অন্য দলকে পদ্যে প্রশ্ন করে। বিরোধী দল পদ্যেই সেই প্রশ্নের উত্তর দেয়। ঠিক উত্তর দিতে না পারিলে পরাজয় বরণ করিতে হয়। ইহাদিগকে "দাঁড়া কবি"ও বলা হইত। এক শ্রেণীর কবির দল আসরে দাঁড়াইয়া মুখে মুখে তখনই গান বাঁধিয়া শ্রোতাদের খুসী করিতেন বলিয়াই তাঁহারা এই নামে পরিচিত হন।

সভায় দাঁড়াইয়া তখনই মুখে মুখে কবিতা রচনা করিয়া উত্তর দেওয়া বা শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করার মধ্যে কৃতিত্ব ছিল বটে, কিন্তু সকল সময়ে গান-রচয়িতা কবিদের মধ্যে প্রতিভার বা কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যাইত না। হয় কুরুচিপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তিতে, নয় অনুপ্রাস-যমক-পরিপূর্ণ কবিতায় কবির গানের আসর বিষাক্ত বা সরগরম হইয়া উঠিত। আজিও কবির গান বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ক্ষীণ প্রাণ লইয়া কোন রকমে টিকিয়া আছে। কবির গানের কবিদিগের রচনা মানুষকে দুইদণ্ডের আমোদ-উত্তেজনা দান করিত। খাঁটি সাহিত্যরস ইহাদের মধ্য দিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উৎসারিত হইত না। তাই এই শ্রেণীর রচনা এককালে বাংলাদেশকে প্লাবিত করা সত্ত্বেও আজ লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

কবির দলে উত্তর-প্রত্যুত্তর কি ভাবে হইত তাহার অনেক নমুনা পাওয়া গিয়াছে। যেমন—একজন পোর্তুগীজ ফিরিঙ্গি বাংলাদেশে বহুকাল বাস করিয়া চমৎকার বাংলা শিখিয়া কবির দল গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম ছিল এণ্টনী ফিরিঙ্গি। তিনি আসরে উঠিয়া দেবীদুর্গার উদ্দেশে গান ধরিলেন—

ভজন পূজন জানিনে মা জেতেতে ফিরিঙ্গি।
যদি দয়া করে তারো মোরে এ ভবে মাতঙ্গী॥

তখন ভোলাময়রা নামে আর এক কবির দলের নেতা এণ্টনী ফিরিঙ্গির প্রতিপক্ষে দাঁড়াইয়া 'মাতঙ্গী' অর্থাৎ দুর্গার জবানীতে উত্তর দিলেন :

তুই জাত ফিরিঙ্গি জবড়জঙ্গী
আমি পারবো নাকো তরাতে।

শোন্ রে ভ্রষ্ট বলছি স্পষ্ট তুইরে নষ্ট মহাদুষ্ট।
তোর কি কালী কৃষ্ট ইষ্ট ?
ভজগে যা তুই যীশুখৃষ্ট
শ্রীরামপুরের গির্জাতে ॥

চতুর কবি এণ্টনী হারিবার পাত্র নহেন! তিনি এবার উত্তর দিলেন :

সত্য বটে আমি হচ্ছি জাতিতে ফিরিঙ্গি
ঐহিকে লোক ভিন্ন ভিন্ন (কিন্তু) অন্তিমে সব একাঙ্গী।
...ইত্যাদি

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বাক্‌চাতুরী, বাক্‌পটুতা এবং উপস্থিত-বুদ্ধির দ্বারা চমক লাগাইয়া একটা চমৎকার সৃষ্টি করাই কবির গানের গায়কদিগের উদ্দেশ্য ছিল। গোঁজলা গুঁই, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, এণ্টনী, শ্রীধর কথক প্রভৃতি অনেক বিখ্যাত কবির-গান-রচয়িতা বাংলাদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে সব চেয়ে ক্ষমতাশালী কবি ছিলেন রাম বসু। তাই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"যেমন সংস্কৃত কবিতায় কালিদাস, বাংলা কবিতায় রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র, কবিওয়ালাদিগের কবিতায় তেমনি রাম বসু।" এই রাম বসুই নাকি 'কবির লড়াই' বা আসরে দাঁড়াইয়া গানে প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর দিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

দু-দণ্ডের আমোদ-উত্তেজনার জন্য কবির গানের মত যাত্রা-গানও বাংলা দেশে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। যাত্রার পালাগানের জনপ্রিয়তা আজিও কমে নাই। যাত্রায় কথাবার্ত্তা হইত পদ্যে, উহাদের মধ্যে গান থাকিত অনেক। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, পুরাণ প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ কাহিনী লইয়া যাত্রার পালা রচিত হইত। গোবিন্দ অধিকারী, নীলকণ্ঠ মুখুজ্জে, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রভৃতি কয়েকজন কবি যাত্রার পালা রচনা করিয়া এবং যাত্রার দল গড়িয়া পালা গাহিয়া খ্যাতিলাভ করিয়া গিয়াছেন। গোপাল উড়ের খ্যাতি ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাধিক ছিল। বিদ্যাসুন্দর পালা রচনা করিয়া ও দলবলসহ

উহা গাহিয়া তিনি খ্যাতিমান্ হইয়াছিলেন। যাত্রাগানের মধ্য দিয়া আনন্দ ও শিক্ষালাভ দুইই হইত, হিন্দুধর্ম্মের অনেক তত্ত্ব, তথ্য, নীতি ও আদর্শের সহিত লোকেরা পরিচয় লাভ করিত।

পাঁচালী গানও এক সময়ে এদেশে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। পাঁচালী গানের উৎপত্তি কীর্ত্তনগান হইতে। পাঁচালীর পালা বাঁধা থাকিত এবং কীর্ত্তনের মত কৃষ্ণলীলার বিষয় লইয়া গান লেখা হইত। তবে পাঁচালীর সঙ্গে কীর্ত্তনের তফাৎ হইতেছে এই যে—পাঁচালী গানের গায়ক পাত্রপাত্রীর সাজ সাজিতেন; মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিতেন। তাছাড়া, কীর্ত্তনের সুরের মধ্যে বিশুদ্ধি থাকে, পাঁচালীর গানের ঢঙে সে বিশুদ্ধি ছিল না। ইহার উপর কবিওয়ালাদিগের প্রভাব পড়িয়াছিল এবং এই শ্রেণীর গান তানপুরা, বেহালা, ঢোল, মন্দিরা প্রভৃতির সাহায্যে গীত হইত। কোন কোন সময়ে পাঁচালীতে কবি-গানের লড়াইয়ের মত দুই দল থাকিত।

পাঁচালী রচয়িতাদের মধ্যে দাশরথি রায় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি কবির দলেও গান বাঁধিয়া দিতেন। এককালে এই দাশরথি রায়ের ছড়া ও পাঁচালী বাংলার লোকেরা বড় আগ্রহ করিয়াই শুনিত।

কবির গান ও পাঁচালী-গান রচনার যুগেই টপ্পা গান রচিত হইয়াছিল। এই শ্রেণীর গান একটি বিশেষ সুরে, লয়ে ও ঢঙে গাওয়া হয়। ইহা বৈঠকী গান। বাংলা টপ্পা গানের প্রথম রচয়িতা রামনিধি গুপ্ত,—ইনি নিধু বাবু নামে বিখ্যাত এবং নিধু বাবুর টপ্পা বাংলাদেশে খুবই সমাদর পাইয়া আসিতেছে।

বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগ

গদ্য

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের। বৌদ্ধগান হইতে রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে শুধু কবিতা ও গানের একাধিপত্য চলিয়া আসিতেছিল। এই সময়টার মধ্যে ধর্ম্মের কথা, জীবনী, অনুবাদ, পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদির কথা সমস্তই পদ্যে লেখা হইতেছিল।

অবশ্য চিঠিপত্রে এবং দলিল-দস্তাবেজে গদ্য ব্যবহার হইত। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টির বাহনরূপে গদ্য এতদিন পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হয় নাই। ইংরেজ আগমনের আগে আমাদের বাংলা দেশে গদ্য সাহিত্য বলিয়া কিছু ছিল না। বাংলা গদ্যে সাহিত্যসৃষ্টি সুরু হইয়াছিল ইংরেজ আমল হইতে—তাহার আগে নয়।

মধ্যযুগে রচিত শূন্যপুরাণের কোন কোন অংশ গদ্যের মত। কেহ কেহ বাংলা প্রাচীন গদ্যসাহিত্যের নমুনারূপে তাহার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহিয়াছেন বটে। কিন্তু তাহা যে ঠিক গদ্য—এমন কথা বলা যায় না। সে রচনা ভাঙা পয়ারের চিহ্ন মাত্র। তাহাকে ঠিক গদ্য বলা যায় না।

বাংলাদেশে ইংরেজরা আসিবার আগে ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্রে ইউরোপীয় যে সকল জাতি এখানে আসিয়াছিল তাহার মধ্যে পর্ত্তুগীজ জাতি একটি। পোর্ত্তুগীজ পাদরীরা বাংলায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতেন। ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধার জন্য এবং খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদের বাইবেলের বিশেষ বিশেষ কাহিনীর সহিত পরিচয় ঘটাইবার জন্য অথবা খৃষ্টধর্ম্মের তত্ত্বের সহিত সকলকার পরিচয় ঘটাইবার জন্য ইঁহারা বাংলা গদ্যে রচনা করেন। ইঁহাদের রচিত "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ" এবং "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"ই বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শনরূপে গণ্য হইয়াছে। বই দু'খানির মধ্যে প্রথমখানি রচিত হয় ১৬৭৪ খৃঃঅব্দে, আর দ্বিতীয়টি রচিত হয় ১৭৪৩ খৃঃঅব্দে। প্রথমখানির লেখক দোম আন্তোনিও, দ্বিতীয়টির লেখক মানুএল দ্য আসসুম্পসাঁও। ইঁহারা দু'জনেই পর্ত্তুগীজ পাদরী।

বই দু'খানিতে প্রশ্নোত্তরের ছলে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মতত্ত্বের কথা আলোচিত হইয়াছিল।

ইহার পর গদ্যের যে সমস্ত নমুনা পাওয়া গিয়াছে তাহা শিলালিপিতে, তাম্রশাসনে, দলিল-দস্তাবেজে ও চিঠিপত্রে সীমাবদ্ধ। সাহিত্যপদবাচ্য গদ্য তাহা নয়।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গোড়াতেই কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এবং শ্রীরামপুরে একটি খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারের কেন্দ্র ইংরেজেরা স্থাপন করিলেন।

ঐ ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আশ্রয়ে এবং শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীদের উদ্যোগে গদ্যরচনার পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

যে সব ইংরেজ রাজকার্য্য করিবার জন্য এদেশে আসিতেন তাঁহাদিগকে বাংলা শিখাইবার উদ্দেশ্যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল! কিন্তু গদ্যে রচিত বাংলা কোন পাঠ্য-পুস্তক তখন রচিত হয় নাই। সুতরাং কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান অধ্যাপক উইলিয়ম কেরী এবং তাঁহার সহকারিগণ গদ্য-গ্রন্থ লিখিতে সুরু করিলেন। ইঁহাদের চেষ্টায় বাংলা গদ্যের প্রাথমিক ভিত্তি বেশ সুদৃঢ়রূপেই স্থাপিত হইয়া গেল। অনেক বই ইঁহারা লিখিলেন। বাংলা গদ্য সাহিত্যের প্রথম যুগের প্রায় সব গদ্য-গ্রন্থই এই কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরী আর তাঁহার সহকারীদের দ্বারা রচিত।

সাহেব হইলেও কেরী বেশ ভাল বাংলা শিখিয়াছিলেন এবং বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ ও অভিধান তিনি রচনা করেন। তাছাড়া "ইতিহাসমালা," "কথোপকথন" ও "হিতোপদেশ" প্রভৃতি কয়েকখানি বই তিনি রচনা করিয়াছিলেন। 'ইতিহাস-মালা'য় ইতিহাসের বিবিধ কাহিনী তিনি বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, 'কথোপকথনে' বাংলার নানান শ্রেণীর এবং বিভিন্ন জেলার স্ত্রী-পুরুষের কথ্যভাষার নমুনা তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন, হিতোপদেশের গল্প তিনি গদ্যে বলিয়াছিলেন।

কেরীর সহকারী যে সব পণ্ডিত বাংলা গদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গদ্য রচনার পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে নাম করিতে হয়—রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, চণ্ডীচরণ মুন্সী, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির। রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র', 'লিপিমালা', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রম্' বিখ্যাত গ্রন্থ।

এই সকল গ্রন্থের মধ্য দিয়া গদ্য রচনার সূত্রপাত হইলেও এগুলি সবই ছিল পাঠ্যপুস্তক। এগুলির ভাষা হয় আরবী পার্শী শব্দের দ্বারা, নয় সংস্কৃত শব্দের দ্বারা কণ্টকিত। বইগুলির ভাষা সকল জায়গায় সহজবোধ্যও নয়।

সুতরাং জনসাধারণের মধ্যে সে যুগে এ সকল বই তেমন প্রচার বা প্রসার লাভ করে নাই। পরবর্ত্তীকালেও সাহিত্য সৃষ্টির নিমিত্ত গদ্যের আদর্শরূপে ঐ সকল বইয়ের ভাষা অনুসৃত হইয়াছিল বলিয়াও মনে হয় না।

শ্রীরামপুরের মিশনারীরাও বাইবেলের অনুবাদ, বাংলা ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি রচনা করিয়া বাংলা গদ্যের পুষ্টি-সাধনে সহায়তা করেন। শ্রীরামপুর মিশন হইতেই সর্ব্বপ্রথম এদেশে বাংলা বই ছাপা হয়। সেখানে উইলকিনসন নামে এক সাহেব একটি ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া বাংলা বই ছাপা সুরু করেন। ইহার আগে বাংলা সকল বই-ই হাতে লেখা পুঁথি হইতে পড়িতে হইত। কিন্তু শ্রীরামপুর মিশনে বাংলা বই ছাপা আরম্ভ হওয়ায় বাংলা গ্রন্থগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ার অভূতপূর্ব্ব সুযোগ লাভ করিল।

উইলকিনসন সাহেব ছাড়া, শ্রীরামপুর মিশনের মার্শম্যান ও ওয়ার্ড সাহেবের কাছে বাংলা দেশ চিরকৃতজ্ঞ। ইঁহারা বাংলা অভিধান, ব্যাকরণ ইত্যাদি রচনা করিয়াছিলেন। বাংলা দেশে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র ছিল না। মার্শম্যান সাহেব উদ্যোগী হইয়া 'দিগ দর্শন', 'সমাচার দর্পণ' নামে পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাংলা সংবাদপত্রের প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে গদ্য রচনার ও আলোচনার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইয়া গদ্য সাহিত্যের এক নবপর্য্যায় আরম্ভ হইয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অথবা শ্রীরামপুর মিশনে বাংলা গদ্যের ভিত্তি রচনা সুরু হইয়াছিল। কিন্তু তখনও বাংলা গদ্য রচনা প্রধানতঃ অনুবাদ অনুকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বাংলা গদ্য তখনও সাহিত্যশ্রী লাভ করে নাই বা পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে ইহার ব্যবহার হয় নাই। কিন্তু রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আবির্ভূত হইয়া বাংলা গদ্য সাহিত্যকে যেন নূতন করিয়া সৃষ্টি করিলেন, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথে ঘটিল তাহার পূর্ণ পরিণতি।

পাঠ্যপুস্তকের সীমার বাহিরেও যে বাংলা গদ্যকে ব্যবহার করা যাইতে পারে তাহা প্রথম দেখাইলেন—রামমোহন রায়। বেদান্তের মত দুরূহ

ধর্ম্ম-বিষয়কে ইনি বাংলা গদ্যে প্রকাশ করিয়া অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

ইঁহার পরেই নাম করিতে হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের। প্রকৃতপক্ষে ইঁহার গদ্য রচনার কাল হইতেই বাংলা গদ্যে সাহিত্যশ্রী ফুটিয়া উঠিতে সুরু করে। বাংলা গদ্যের মধ্যেও যে একটা ছন্দ ও তাল আছে তাহা বিদ্যা-সাগরের কালেই সর্ব্বপ্রথম ধরা পড়ে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'শকুন্তলা'র ভাষার সরস মাধুর্য্য এবং 'সীতার বনবাসের' ওজস্বিতা বাংলা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি সৌন্দর্য্যের কথা সাধারণের মধ্যে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিল।

তারপর অক্ষয়কুমার দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি লেখকগণের দ্বারা বাংলা গদ্য পরিপুষ্ট হইতেছিল, কিন্তু প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্র প্রশস্ততর হইল। সেই প্রথম বাংলা গদ্যে মৌলিক সৃষ্টির এবং চলতি ভাষায় রচনার উদ্যম দেখা গিয়াছিল।

কেরী হইতে বিদ্যাসাগর, বিদ্যাসাগর হইতে প্যারীচাঁদের প্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের যে উদ্ভব ও প্রকাশ—তাহারই পরিণতি বঙ্কিমচন্দ্রে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা গদ্যে নূতন অনুপ্রেরণা আনিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিভার জ্যোতিতে বাংলা গদ্য সাহিত্যের নানা বিভাগ পুষ্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি উপন্যাস লিখিলেন, 'বঙ্গদর্শন' নামক মাসিক পত্রিকার মধ্যে তিনি সামাজিক সমস্যা লইয়া, ঐতিহাসিক কথা লইয়া, ধর্ম্মের বিষয় লইয়া প্রবন্ধ লিখিলেন। সাহিত্য-সমালোচনা করিলেন, 'কমলাকান্তের দপ্তরের' মধ্য দিয়া সহজ সুন্দর অনাবিল হাস্যরস পরিবেষণ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভায় বাংলা গদ্য-সাহিত্য চিরদিনের জন্য মহনীয় হইয়া উঠিল। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে বাংলা গদ্যের শক্তি ও সমৃদ্ধি আরও বাড়িল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাষাকে লালন করিয়াছেন, তাহাকে বিশ্ব-সাহিত্যের সমপর্য্যায়ে দাঁড় করাইয়া গেলেন রবীন্দ্রনাথ!

উপন্যাস

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাস বেশীদিনের নহে। গদ্য রচনার সূত্রপাত হইবার পর উপন্যাস রচনার চেষ্টা সুরু হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষিত বাংলা ভাষার লেখকগণ ইংরাজী সাহিত্যে প্রচলিত উপন্যাসসকল অনুশীলন করিয়া এবং সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উপন্যাস রচনা করিতে আরম্ভ করেন।

বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল"। বইখানির লেখক প্যারীচাদ মিত্র। তিনি টেকচাঁদ ঠাকুর এই ছদ্মনামে বইখানি প্রকাশ করেন।

ঔপন্যাসিক হিসাবে প্যারীচাঁদের পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের নাম করিতে হয়। প্যারীচাঁদের উপন্যাস প্রকাশের পর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস প্রকাশের আগে—এই সময়টুকুর মধ্যে কোন কোন লেখক অবশ্য উপন্যাস লেখার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে নাম করিতে হয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ও "অঙ্গুরীয় বিনিময়" বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস।

কিন্তু বঙ্কিম-পূর্ব্বযুগে উপন্যাস রচনা হইলেও, সে সকলের মধ্যে উপন্যাসের মৌলিক উপাদানসমূহ ছিল না। উহাদের মধ্যে সুবিন্যস্ত কোন কাহিনী ছিল না—কতকগুলি খণ্ড খণ্ড চিত্রের বা চরিত্রের সমষ্টিতে সে সকল রচনা পরিণত হইয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না। প্যারী-চাঁদের "আলালের ঘরের দুলাল"ও সেই হিসাবে পূর্ণাঙ্গ বা সার্থক উপন্যাস হইয়া উঠে নাই। উপন্যাসের বহুতর লক্ষণ ইহার মধ্যে বর্ত্তমান ছিল—এই পর্য্যন্ত।

বঙ্কিমচন্দ্রই বাস্তবিকপক্ষে সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় সার্থক উপন্যাস রচনা করেন। তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'। তাহার পর তিনি কপাল-কুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, সীতারাম প্রভৃতি অনেক উপন্যাস রচনা করেন।

তাঁহার উপন্যাসের কতকগুলি ইতিহাসকে ভিত্তি করিয়া রচিত; যেমন,—রাজসিংহ, দুর্গেশনন্দিনী। কতকগুলি সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনের চিত্র; যেমন—কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, রজনী প্রভৃতি। কতকগুলি ইতিহাস ও সামাজিক কাহিনীর সমন্বয়ে লেখা; যেমন—চন্দ্রশেখর, কপাল-কুণ্ডলা, মৃণালিনী। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কল্পনাপ্রবণ স্রষ্টা, তাই তাঁহার সকল উপন্যাসই আদর্শের দীপ্তিতে উজ্জ্বল, বাস্তবের ছবি তাঁহার মধ্যে কম।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কালে অথবা পরে বাংলা সাহিত্যে কয়েকজন ক্ষমতাশালী ঔপন্যাসিক আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহারা হইতেছেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি। সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ ছিলেন। ইঁহার "জাল প্রতাপচাঁদ", হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "বেনের মেয়ে", "বাল্মীকির জয়", রমেশচন্দ্র দত্তের "রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা", "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত", "সমাজ", "সংসার" প্রভৃতি উপন্যাস খুব জনপ্রিয়। রমেশচন্দ্রের "রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা" ও 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" ঐতিহাসিক উপন্যাস, তাঁহার "সমাজ" ও "সংসার" সামাজিক উপন্যাস। "সমাজ" ও "সংসারে" রমেশচন্দ্র পল্লীগ্রামের গৃহস্থদের কথা অতি সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন—এই দুই উপন্যাসে চমৎকার পল্লীচিত্র আছে। ৮

তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের "স্বর্ণলতা"র ভাষা ও কাহিনী চমৎকার। ইহাতে সমাজ-চিত্র ও চরিত্র-চিত্র খুবই কুশলতার সহিত লেখক অঙ্কন করিয়াছেন। মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র সমাজের কাহিনী এই উপন্যাসে বলা হইয়াছে।

হাস্যরসপ্রধান ও বিদ্রূপাত্মক রচনায় বঙ্কিম-যুগের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিদ্রূপাত্মক রচনায় সে যুগে ত্রৈলোক্যনাথের জুড়ি ছিল না।

ইহার পরে একে একে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উপন্যাস জগতে এক নবযুগের সৃষ্টি

করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রধানতঃ কবি। তাই তাঁহার সকল সৃষ্টি—এমন কি উপন্যাসও—কাব্যধর্মী। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে বাস্তবের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের কথা আছে। উপন্যাসের মধ্যে তিনি আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের জটিলতম সমস্যাগুলি বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং উপন্যাস রচনা করিতে নামিয়া তিনি শুধু মানুষের বাহিরের জীবন বা সমাজ-সংসারের বাহিরের ঘটনাস্রোতের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নাই। জীবনের অসংখ্য ঘটনার উপর দিয়া তিনি শুধু চোখ বুলাইয়া লইয়াছেন। কিন্তু দৃষ্টিকে তিনি প্রসারিত করিয়া দিয়াছেন তাহাদের অনেক নীচে—অন্তরের তলদেশে। নরনারীর মনের লীলাই রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের উপজীব্য। মনের তত্ত্ব এবং দ্বন্দ্ব প্রকাশ করিতে এবং তাহার বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী।

উপন্যাস রচনায় রবীন্দ্রনাথ যে পথ ধরিয়া চলিয়াছিলেন, শরৎচন্দ্র সেই পথ অনুসরণ করিয়াও যথেষ্ট স্বকীয়ত্ব ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছেন। শরৎচন্দ্র বিশেষভাবে বাস্তব জীবনকে রসদৃষ্টিতে দেখিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন এবং সাহিত্যে যাহারা বহুকাল অপাংক্তেয় ছিল তাহাদেরও তিনি তাঁহার উপন্যাসসমূহে স্থান দিয়াছেন। অর্থাৎ সমাজ যাহাদিগকে হীন অথবা পতিত বলিয়া মনে করিয়া বহুকাল দূরে সরাইয়া রাখিয়াছিল তাহাদের আনন্দ বেদনার কাহিনী শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে আঁকিয়াছেন। সমাজে যাহারা হীন, অসহায়, অবহেলিত বা অবনমিত, নির্য্যাতিত বা নিপীড়িত তাহাদের কথা সহানুভূতির সহিত শরৎ-সাহিত্যে চিত্রিত হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে যে সকল চরিত্র হীন বা নীচ বলিয়া মনে হয় তাহাদের মধ্যেও শরৎচন্দ্র মহত্ত্ব, স্নেহ, করুণা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট গুণগুলি দেখিয়াছিলেন এবং তাহাদের কাহিনীই তাঁহার উপন্যাসে বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার উপন্যাসের চরিত্রগুলি ভালো-মন্দে গড়া মানুষ। মন্দের মধ্যেও ভালোটুকু আবিষ্কার করাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির বিশেষত্ব।

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের যে নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন সেই যুগে অনেক ক্ষমতাশালী উপন্যাস-রচয়িতা আবির্ভূত হন। তাঁহাদের

মধ্যে নাম করিতে হয়—জলধর সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেন, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির।

শরৎচন্দ্রের পরে আসিল বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের অতি আধুনিক যুগ। এখনও বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যে এই যুগ চলিতেছে। এই যুগে উপন্যাস রচনা করিয়া যাঁহারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, মণীন্দ্রলাল বসু, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, সুবোধ ঘোষ, সরোজকুমার রায় চৌধুরী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র পর্যন্ত উপন্যাসের ক্ষেত্র যাহা ছিল, তাহাকেই এই সকল ঔপন্যাসিক অধিকতর প্রশস্ত করিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে দীন দরিদ্র, অসহায় হীন পতিত, উপেক্ষিত ও অবনমিত সম্প্রদায় স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু অতি আধুনিক ঔপন্যাসিকগণের অনেকেই খনির ও কলের শ্রমিকদের অথবা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ লইয়া উপন্যাস রচনা করিয়াছেন। তা ছাড়া, দেশ ও সমাজের যে-সব জিনিষ বহুদিন সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল, ইঁহাদের দৃষ্টি সেই দিকে গিয়াছে। বাংলার সীমান্তবাসী সাঁওতাল বাউড়ীদের জীবনচিত্র অঙ্কিত করিয়াও ইঁহারা বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের পরিধি প্রসারিত করিয়াছেন। এইভাবে বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য বিচিত্রতার ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্য নারী ঔপন্যাসিকগণের দানেও সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী এ বিষয়ে পথপ্রদর্শক। তা ছাড়া, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভাবতী দেবী প্রভৃতির নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষা-সংস্কার ও প্রচারকার্য্যের প্রয়োজনেই বাংলা গদ্যের সূচনা হইয়াছিল। দীর্ঘকাল এই প্রয়োজনের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকায় বাংলা গদ্যের বিকাশ সঙ্কুচিত হইয়াছিল। কিন্তু উপন্যাস-সাহিত্যের উদ্ভব ও তাহার পরিণতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যেরও চরম পরিণতি লাভ সম্ভব হইয়াছে।

ছোট গল্প

গল্প শুনিতে কে না ভালবাসে! ভালবাসে সকলেই। শিশু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই ঠাকুরদা'র কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আব্দার করে—"দাদু, গল্প বল না!" ঠাকুমার কোলে ঘেঁষিয়া বসিয়া তাহারা রূপকথার গল্প শুনিতে কতই না ভালবাসে! ছাত্রেরা তাহাদের শিক্ষক ও অভিভাবকদের লুকাইয়া স্কুল-কলেজের পড়ার বইয়ের নীচে গল্পের বই লইয়া পড়ে। মেয়েরা নিপুণ হাতে সংসারের কাজকর্ম্ম সারিয়া গল্পের বই পড়িয়া দুপুর বেলাটা কাটাইয়া দেয়। কেরানী ডেস্ক-বোঝাই ফাইলের মাঝে বসিয়া ফাঁক পাইলেই যাহা সবচেয়ে বেশী ভালবাসে তাহা হয় গল্প করা, নয় গল্প পড়া। বৃদ্ধেরাও গল্পের বই পড়িতে ভালবাসেন—অন্ততঃপক্ষে রামায়ণ মহাভারতের গল্প তাঁহাদের পড়া চাই-ই। গল্প শোনার প্রবৃত্তি মানুষের চিরন্তন। কিন্তু বাংলা গল্পরচনার ইতিহাসকে—বিশেষতঃ বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগে গল্পরচনার ইতিহাসকে খুব বেশী দূর পিছনে টানিয়া লইয়া যাওয়া যায় না। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের রামরাম বসু ও উইলিয়াম কেরী কতকগুলি প্রচলিত লৌকিক ও ঐতিহাসিক গল্প সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সেগুলিকে এবং বিদ্যাসাগরের বর্ণ-পরিচয়ের 'ভুবনের' গল্পটিকে বাংলা ছোট গল্পের আদিম নিদর্শনরূপে ধরা যাইতে পারে। তারপর "বঙ্গদর্শনে" বঙ্কিমের অগ্রজ পূর্ণচন্দ্র ও সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কয়েকটি ছোট গল্প প্রকাশিত হইয়াছিল ছোট গল্প হইলেও ঐ সকল গল্পের সবগুলিতে ছোট গল্পের ঠাট অথবা সকল লক্ষণ যে বজায় ছিল এমন কথা বলা যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন বাংলা উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেন, তেমনি তিনি ঠিক ছোট গল্প সৃষ্টি না করিলেও—"রাধারাণী", "যুগলাঙ্গুরীয়", এবং "ইন্দিরা"র মত বড় গল্প রচনার পথ দেখাইয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথই বলিতে গেলে বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্পের স্রষ্টা। স্বল্পায়তনের মধ্যে জীবন ও চরিত্রকে বিকশিত করিয়া তোলার অথবা একটিমাত্র অনুভূতিকে রূপায়িত করার মধ্যেই ছোট গল্পের সার্থকতা। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলিই সর্ব্বপ্রথম ছোট গল্প রচনার সকল আদর্শকে মানিয়া চলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পগুলি অপরূপ সৃষ্টি। অমন গল্প পৃথিবীর গল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে অল্পই আছে। তাই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ যদি অন্য কোন সৃষ্টি না করিয়া,—কবিতা, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস রচনা না করিয়া শুধু গল্প রচনা করিতেন, তাহা হইলেই তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত হইতে পারিতেন।

ছোট গল্পের স্রষ্টা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের পরেই নাম করিতে হয় শরৎ-চন্দ্রের। তাঁহার 'মহেশ', 'ছবি', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি গল্প অতুলনীয় সৃষ্টি।

ছোট গল্পে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরেই নাম করিতে হয়—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, জলধর সেন, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, মণীন্দ্রলাল বসু, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, গোকুল নাগ প্রভৃতির।

ইঁহাদের সমবেত চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে ছোট গল্প শুধু সংখ্যার অনুপাতে নয়,—গুণে, শিল্প-চাতুর্য্যে ও রসমাধুর্য্যে জগতের ছোট গল্প সাহিত্যের মধ্যে একটি বিশিষ্ট আসন করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ বসু প্রভৃতিও বাংলা ছোট-গল্পের একটি বিশেষ মূর্ত্তি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইঁহাদের কাহারও কাহারও ছোটগল্প কল্পনাপ্রবণ রস-দৃষ্টি লইয়া লিখিত, কাহারও গল্প বাস্তব অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

নাটক

বাংলা দেশে গদ্যের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যেমন উপন্যাস ও ছোটগল্প রচনার সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, তেমনি নাটক রচনার উৎসাহও গদ্যের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে এদেশে জাগিয়াছিল।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটকের অস্তিত্ব ছিল না। তবে যাত্রাভিনয় এদেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই বাংলা দেশে শিবমাহাত্ম্য অবলম্বন করিয়া, অথবা রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী লইয়া যাত্রাভিনয় প্রচলিত ছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণলীলার অভিনয়ও আরম্ভ হয়। কিন্তু যাত্রা হইতে বাংলা নাটকের উৎপত্তি হয় নাই। যাত্রায় যে রকম নাচ-গানের বাহুল্য অথবা ভাবপ্রবণতা থাকে, যে রকম ধর্ম্মভাব অথবা দেবমহিমা-কীর্ত্তন থাকে,—তাহাতে যাত্রা হইতে নাটকের উদ্ভব সম্ভব হয় নাই। যাত্রায় থিয়েটারের মত দৃশ্যপটও থাকে না। উহার অভিনয় হয় খোলা জায়গায়। এ কারণেও যাত্রাকে ভিত্তি করিয়া নাটক উৎপত্তিলাভ করিতে পারে নাই।

নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ হয় এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা সংস্কৃতির প্রভাব সূচিত হইবার পরে। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য আদর্শে এদেশে রঙ্গমঞ্চ স্থাপনের পর হইতেই নাট্য-সাহিত্যের উদ্ভব হয় এবং ক্রমশঃ তাহা পরিণতির পথে অগ্রসর হইতে থাকে।

বাংলা গদ্য সাহিত্য যেমন প্রথম যুগে কেরী মার্শম্যান প্রমুখ বিদেশীদের কাছ হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়া ক্রমশঃ পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, বাংলা নাট্য-সাহিত্যেরও গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন তেমনি জনৈক রুশদেশীয় ব্যক্তি—তাঁহার নাম ছিল হেরাসিম লেবেডেফ। ১৭৯৫ সালে লেবেডেফ বেঙ্গল থিয়েটার নামে একটি রঙ্গমঞ্চ স্থাপনা করেন এবং সেখানে দুইখানি ইংরাজি নাটক বাংলায় অনুবাদ করাইয়া অভিনয় করান।

ইহা দেখিয়া থিয়েটারের নূতনত্বে বাংলাদেশের ধনীরা মাতিয়া উঠিলেন এবং রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া বাংলা নাটক রচনা করাইয়া সেই সকল নাটককে সেখানে অভিনয়ের ব্যবস্থা তাঁহারা করিতে লাগিলেন। এইভাবে প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তি রঙ্গমঞ্চ স্থাপন করিয়া বাংলা নাটকের বিকাশের পথকে প্রশস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত রঙ্গালয়ই দেশীয় ব্যক্তির দ্বারা স্থাপিত প্রথম রঙ্গমঞ্চ।

কিন্তু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের প্রথম যুগে যে সকল নাটক রচিত হইত, সেগুলির অধিকাংশই হয় ইংরাজি হইতে, নয় সংস্কৃত হইতে অনুবাদ; তাছাড়া সমস্ত নাটকই ছিল সংস্কৃত নাটকের ছাঁদে ঢালা। ঐ সব অনুবাদ এবং অনুকরণাত্মক নাটক সে যুগের ইংরাজি শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে তৃপ্তিদান করিতে পারিতেছিল না।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রথম যুগে সংস্কৃত নাটকের রচনাপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া যে সব নাটক রচিত হইয়াছিল অথবা অভিনীত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রামনারায়ণ তর্করত্নের "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব", "নবনাটক", "রত্নাবলী" প্রভৃতি নাটক। "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল", "উভয় সঙ্কট", "চক্ষুদান" নামে ক'খানি প্রহসনও ইনি রচনা করেন।

সামাজিক সমস্যাকে ভিত্তি করিয়া নাটক রচনার সূত্রপাত একরকম রামনারায়ণ তর্করত্নই করিয়াছিলেন। তাঁহার "কুলীনকুলসর্ব্বস্ব" নাটকে বাংলা-দেশের কুলীনদিগের বিবাহ প্রথার দোষ হাস্যরস সৃষ্টি করিয়া বুঝান হইয়াছে। "নবনাটকে" বহুবিবাহের দোষ দেখান হইয়াছে। রত্নাবলী, বেণীসংহার, মালতীমাধব নামে যে কয়েকটি নাটক তিনি রচনা করেন সেগুলি সবই সংস্কৃত হইতে অনূদিত। সে যুগে নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিয়া "নাটুকে রামনারায়ণ" এই নামে তিনি সমাজে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

রামনারায়ণ তর্করত্নের সকল নাটকই সংস্কৃত নাটক রচনার রীতিতে রচিত হইয়াছিল। তবু তাঁর নাটকের কোন কোন অংশে, কোন কোন চিত্র বা চরিত্রবর্ণনায় যে বাস্তবতা অথবা সরস স্বচ্ছন্দতা ছিল না এমন নয়। তাঁহার

নাটকে একদিকে উপমা অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি, অন্যদিকে বাংলার নিজস্ব ছড়া, প্রবচন ও কথোপকথনের ভঙ্গী। যেখানে উপমা অনুপ্রাসের বাহুল্য—সংস্কৃত রচনাপদ্ধতির দাসত্ব তিনি করিয়াছেন,—সেখানে তাঁহার রচনা আড়ষ্ট। কিন্তু ছড়া কাটিয়া অথবা প্রবচন বলিয়া চরিত্রসকল যেখানে কথোপকথন করিয়াছে, তাঁহার নাটকের সেই সকল স্থান স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ হইয়াছে।

রামনারায়ণের প্রতিভা ছিল। তবু বাংলা নাটকের যথার্থ এবং পরিপূর্ণ রূপ তিনি ফুটাইয়া তুলিতে সমর্থ হন নাই। সংস্কৃত নাটকের প্রভাব তাঁহার পরিপূর্ণ সার্থকতার অন্তরায় হইয়াছিল।

ইংরাজি সাহিত্যে যে ধরণের নাটক প্রচলিত ছিল, যখন সেই আদর্শে বাংলা নাটক রচিত হইতে আরম্ভ করিল,—তখনই বাংলা নাটকের উন্নতি ও বিকাশের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল। তখন হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় তাহাদের মনের খোরাক নিজ দেশের আঙিনায় ফলিতে দেখিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে সুরু করিয়াছিল।

সংস্কৃত নাটকের অনুসরণ ও অনুকরণ ছাড়িয়া সর্ব্বপ্রথম যে নাটকখানি পাশ্চাত্য নাটকের রীতিতে রচিত হইয়াছিল, তাহার নাম 'ভদ্রার্জ্জুন'। ইহার লেখক তারাচরণ শিকদার। ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্রমবিকাশে এই নাটকখানির বিশেষ মূল্য আছে। কারণ, নাটকখানি প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার জনসাধারণ দেখিল যে, পাশ্চাত্য নাটকের পদ্ধতি অনুসারে বাংলা নাটক রচনা করা সম্ভবপর। এই সূত্রে বাংলা ভাষায় নাটক রচনার নূতন রীতি প্রবর্ত্তিত হইল।

তবে তারাচরণ শিকদার পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত প্রথম বাংলা নাটক রচনা করিলেও, বাংলা নাট্যসাহিত্যকে ঠিক আধুনিকতায় দীক্ষা দিতে তিনি সমর্থ হন নাই। সে দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন—মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

১৮৫৮ সাল। পাইকপাড়ার রাজারা বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা 'রত্নাবলী' নাটকখানির অভিনয়ের

আয়োজন করিতেছিলেন। অনেক ইংরাজ, এবং বাংলা জানেন না এমন অনেক দর্শক সেখানে আসিবেন। সুতরাং ঠিক হইল, তাঁহাদের বুঝিবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরাজি অনুবাদ করিয়া লওয়া হউক। উহা বাংলা ভাষায় অনভিজ্ঞ দর্শকদের মধ্যে বিতরণ করা হইবে।

কিন্তু কে অনুবাদ করিবেন? ইংরাজি ভাষার উপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের গভীর পাণ্ডিত্য ও অধিকারের কথা তখন দেশময় সুবিদিত। কাজেই রাজারা মধুসূদনকে আহ্বান করিয়া তাঁহার উপর নাটকখানি অনুবাদ করিবার ভার দিলেন।

মধুসূদন নাটকখানির অতি সুন্দর অনুবাদ করিলেন। তাঁহার অনুবাদ পাঠ করিয়া তখনকার বাংলার লাট সাহেব, তাঁহার পত্নী এবং অন্যান্য বহু লোক মুগ্ধ হইলেন। সংবাদপত্রসমূহে মধুসূদনের অনুবাদের প্রশংসা হইল।

এই 'রত্নাবলী' নাটকের অনুবাদ করিতে নামিয়া মধুসূদন বেলগাছিয়া নাট্যশালার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলেন এবং মাঝে মাঝে নাটকখানির রিহার্সালেও উপস্থিত থাকিতেন। ঐ সময় একদিন তিনি সেখানে তাঁহার অন্তরঙ্গ সুহৃদ গৌরদাস বসাকের নিকট মন্তব্য করিলেন—"রত্নাবলী নাটকখানি অকিঞ্চিৎকর। এই নাটক অভিনয়ের জন্য রাজারা এত টাকা খরচ করিতেছেন! দেখিয়া দুঃখ হয়।" উত্তরে গৌরদাস বসাক বলিলেন, "ভাল নাটক বাংলা ভাষায় থাকিলে আমরা রত্নাবলীর অভিনয় করিতাম না।"

মধুসূদন বলিলেন,—"ভাল নাটক! আচ্ছা আমি রচনা করিব।"

গৌরদাস বসাক মধুসূদনের আকৈশোর সুহৃদ্। মধুসূদনের বাংলা ভাষার জ্ঞান যে কিরূপ তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন। একদিন কলেজে মধুসূদন "পৃথিবী" লিখিতে "প্রথিবী" লিখিয়াছিলেন। সেই মধুসূদন বাংলা ভাষায় নাটক রচনা করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন! কথাটা শুনিয়া গৌরদাস বসাক আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু সে ভাবটা প্রকাশ না করিয়া শুধু বলিলেন,—"ভালই! ইচ্ছা হইলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পার।"

এই কথোপকথনের পরেই লাইব্রেরী হইতে বহু বাংলা ও সংস্কৃত বই আনাইয়া মধুসূদন পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই একখানি নাটকের খানিকটা অংশ রচনা করিয়া বন্ধু গৌরদাস বসাককে দেখাইলে তিনি মধুসূদনের প্রতিভায় বিস্মিত হইয়া গেলেন। দেখিলেন,—সত্যসত্যই মধুসূদন বাংলা নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন আদর্শ ও নূতন পদ্ধতি লইয়া অবতীর্ণ হইতে যাইতেছেন। বন্ধুকে তিনি অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহার মারফৎ মধুসূদনের এই নাটকের পাণ্ডুলিপি রাজাদের নিকটও পৌঁছিল। তাঁহারা নাটকখানি পড়িয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ইহা সাফল্যের সহিত অভিনীত হইল। এই নাটকখানির নাম ছিল 'শর্ম্মিষ্ঠা'। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাংলা রচনা।

মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক পাশ্চাত্য আদর্শে রচিত হইয়াছিল। তিনি ইংরাজিতে সুশিক্ষিত ছিলেন। ইংরাজি ভাষায় লিখিত নাটকের মধ্যে ঘটনা ও দৃশ্য-সংস্থান তিনি ভাল করিয়াই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। নাটক রচনায় প্রাচীন সংস্কৃত আদর্শের অনুকরণে বাংলার নাট্যকারদের চিন্তার চরণে যে শৃঙ্খল পড়িয়াছিল, পাশ্চাত্য আদর্শে 'শর্ম্মিষ্ঠা' রচনা করিয়া মধুসূদন সেই বন্ধনকে ছিন্ন করিলেন। বাংলা নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

সংস্কৃত পণ্ডিতগণের নিকট মধুসূদনের 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক সমাদর বা প্রশংসা লাভ করে নাই। কিন্তু সেকালের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায় পরম উৎসাহে মধুসূদনকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। 'শর্ম্মিষ্ঠা' নাটক রচনার পরে মধুসূদন 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নামে দুখানি প্রহসন রচনা করেন। প্রথমখানিতে তিনি সেকালের ইংরাজি শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। দ্বিতীয়টিতে প্রাচীনদিগের মধ্যেকার দুর্নীতিসকলকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন। বাস্তবজীবনের ছবিকে তিনি অতুলনীয় কুশলতার সহিত ঐ দুই প্রহসনে রূপায়িত করিয়াছিলেন।

অতঃপর তিনি আরও দু'খানি নাটক রচনা করেন। একখানির নাম 'পদ্মাবতী', অন্যখানি 'কৃষ্ণকুমারী নাটক'। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকখানি বিয়োগান্তক। সংস্কৃত সাহিত্যে বিয়োগান্তক নাটক একখানিও নাই, বাংলায়ও বিয়োগান্তক নাটক ছিল না। মধুসূদনের বিয়োগান্তক নাটক নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে নূতন পথের সন্ধান দিল।

মধুসূদনের পরেই নাটক রচনায় অসামান্য কৃতিত্বের জন্য নাম করিতে হয় দীনবন্ধু মিত্রের। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বিখ্যাত নাটক। এই নাটকে বাংলাদেশের নীলকর সাহেবদের অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে। যখন এই নাটক অভিনীত হইয়াছিল, তখন দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

নীলকর সাহেবেরা নীল-চাষীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করিত, পীড়ন করিত। এই নাটকের অভিনয়ের পর সেই অত্যাচারের মাত্রা কমিয়াছিল। আমেরিকায় 'আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন' নাটক প্রকাশিত হইবার পর সেখানে দাসত্ব প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল। সেদেশে 'আঙ্কল্ টম্‌স্ কেবিন' যে কাজ করিয়াছিল, বাংলা দেশে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' সেই কাজ করিয়াছিল। 'নীলদর্পণে' চরিত্রাঙ্কনে দীনবন্ধু অসাধারণ নিপুণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র এবং চিত্র বাস্তব হইয়াছে। নাটকের মধ্যে বর্ণিত নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-উৎপীড়নের চিত্রে আমাদের অন্তরে দুঃখের তরঙ্গ উদ্বেল হইয়া উঠে। নীলচাষীদের অসহায়ত্ব লেখক গভীর সহানুভূতির সহিত অতি করুণ করিয়া আঁকিয়া গিয়াছেন।

'নীলদর্পণ' ছাড়া দীনবন্ধু রচনা করেন—'নবীনতপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী', 'জামাই বারিক' ও 'কমলে কামিনী'। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ও 'কমলে কামিনী' নাটক দুইখানি ছাড়া, অন্য সকল রচনাই প্রহসন বা প্রহসনের লক্ষণাক্রান্ত। প্রহসন রচনায় দীনবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিল সমাজশোধন।

দীনবন্ধুর নীলদর্পণের মত তাঁহার 'সধবার একাদশী'ও সার্থক সৃষ্টি। ইহার মধ্যে চরিত্রসৃষ্টি সার্থক এবং অবিরত হাস্যকৌতুকের পাশাপাশি করুণরসের একটা ফল্গুস্রোত প্রবাহিত হইয়া নাটকখানিকে ট্র্যাজেডির রসে সিক্ত করিয়া রাখিয়াছে।

'লীলাবতী', 'নবীনতপস্বিনী' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তেও কবির চরিত্রচিত্রণ-কুশলতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রচনার হাস্যরস মাঝে মাঝে কুরুচিপূর্ণ হইলেও, স্থানে স্থানে উহা বেশ উপভোগ্য।

দীনবন্ধুর পরে নাটক রচনায় বিশেষভাবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁহার পরেই নাম করিতে হয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের। ইনি সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক—বিবিধ বিষয় লইয়া নাটক রচনা করিয়াছিলেন। নাটকের চরিত্রসৃষ্টিতে ও ঘটনাবিন্যাসে গিরিশচন্দ্র কৃতিত্বেরই পরিচয় দিয়াছিলেন।

মধুসূদনের আবির্ভাবকালের সময় হইতে গিরিশচন্দ্রের অভ্যুদয়কালের মধ্যে যে সকল নাট্যকার নাটক রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্তে ও রচনার সফলতায় বঙ্গসাহিত্যে অবিচ্ছিন্ন ও ধারাবাহিক ভাবে নাটক রচনা আরম্ভ হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, অমৃতলাল বসু প্রভৃতির নাটক বাংলা নাটক রচনার সম্ভাবনার ক্ষেত্রটিকে প্রসারিত করিয়া নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধির পথে বহুদূর অগ্রসর করিয়া দিয়াছিল।

আধুনিক যুগে রবীন্দ্রনাথের নাটকের বিশেষত্ব আমাদের চোখে না পড়িয়া যায় না। তিনি বাংলা সাহিত্যে নূতন রীতির নাটকরচনা-পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাটকগুলি ঘটনাপ্রধান নহে, ভাবপ্রধান।

নাটকে মানুষের যে জীবনকে ফুটাইয়া তোলা হয়, তাহা মানুষের ভাবজীবন নয়, কর্ম্মজীবন। ঘটনাস্রোতের উপর নাটকরচয়িতাকে চোখ রাখিতে হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার নাটকগুলিতে মানুষের কর্ম্মজীবনকে না ফুটাইয়া, তাহার ভাবজীবনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন। ঘটনার

উপর দৃষ্টিকে নিবদ্ধ না রাখিয়া তিনি চরিত্রগত সূক্ষ্ম ভাবরহস্যকে রূপদান করিয়াছেন। এই কারণেই তাঁহাকে নাটকের এক অভিনব ভঙ্গিমা ও নূতন রূপের আশ্রয় লইতে হইয়াছে।

রবীন্দ্রোত্তর কালেও অনেক নাটক রচিত হইয়াছে ও হইতেছে।

কাব্য

ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রাচীন যুগের অবসান হইয়াছিল। তারপর আমাদের সাহিত্যে কবিওয়ালাদিগের যুগ আসিয়াছিল। কবিওয়ালা প্রভৃতিদের পরেই বাংলা কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্তকে কেহ কেহ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম কবি বলিয়া থাকেন। তাঁহার কবিতায় আধুনিকতার কোন কোন লক্ষণ আছে বটে, কিন্তু তবু তাঁহাকে ঠিক আধুনিক যুগের প্রথম কবি বলা যায় না। কারণ, তাঁহার রচনার মধ্যে কবিওয়ালাদিগের প্রভাব খুব বেশি ছিল। কবিওয়ালাদের মত যমক-অনুপ্রাসাদির সাহায্যে চমক-লাগানো কবিতা তিনিও রচনা করিয়াছিলেন। যেমন—

বন হতে এল এক টিয়ে মনোহর।
সোনার টোপর শোভে মাথার উপর ॥
এমন মোহন মূর্তি দেখিতে না পাই।
অপরূপ চারুরূপ, অনুরূপ নাই ॥

*　　*　　*　　*

কে কামিনী একাকিনী বাস করে বনে ॥
লোকে বলে আনারস, আনারস নয়।
আনারস হলে কেন, জানারস হয় ॥
তারে তার জানা হায়, রস ষোল আনা।
অরসিক লোকে তারে তবু বলে আনা ॥

ফেলিয়া পনের আনা, এক আনা রাখে।
এই হেতু "আনারস", বলে লোকে তাকে॥
অরসিকে নাহি করে রসেতে প্রবেশ।
আনাতেই ষোল আনা, না জানে বিশেষ॥
কোথা বা আনার রস, এ আনার কাছে।
ক্ষুদ্র দানে খেতে পাই, এতটুকি গাছে॥

* * * *

আনা দরে আনা যায় কত আনারস।
অনায়াসে করি রসে ত্রিভুবন বশ॥

এখানে এক "আনা" শব্দ বিভিন্ন অর্থে বারংবার ব্যবহৃত হইয়া আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে।

কবির দলের জন্যও ঈশ্বর গুপ্ত অনেক সময়ে গান বাঁধিয়া দিতেন। ফলে অজ্ঞাতসারেই কবির গানের রচনাভঙ্গী তাঁহার রচনায় মাঝে মাঝে ফুটিয়া উঠিত।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতায় মধ্যযুগীয় ভাব-ভঙ্গী থাকিলেও তাঁহার মধ্যে নূতনত্বও কম ছিল না। কবিতার বিষয়-নির্ব্বাচনে তিনি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছিলেন। দেশভক্তিমূলক কবিতা তিনিই প্রথম রচনা করেন। তাঁহার ব্যঙ্গকবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ।

কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্যের সংস্কার-সাধনে ঈশ্বর গুপ্তের অধিকতর কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার সম্পাদিত 'সংবাদপ্রভাকরে' সে যুগের অনেক কবিই তাঁহাদের রচনা প্রকাশ করিয়া খ্যাতিমান্ হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের যুগ হইতেই বাংলার কাব্যসাহিত্যে একটা কুরুচির স্রোত বহিতেছিল। কবিওয়ালাদের যুগে তাহা খুবই প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যঙ্গকবিতা রচনার দ্বারা বাঙ্গালীকে হাস্যরসে অভিষিক্ত করিয়া ঈশ্বর গুপ্ত সেই কুরুচির স্রোতকে ব্যাহত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এইরূপে তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশের পথকে

সুগম করিয়া দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নবযুগের উপযোগী নূতন কবিতা বা কাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করার মত সামর্থ্য তাঁহার ছিল না। নূতন যুগের উপযোগী কবিতা রচনার যে পথ তিনি তৈয়ারী করিয়া গিয়াছিলেন, সেই পথে চলিয়া মধুসূদনই সর্ব্বপ্রথম বাংলা কাব্যসাহিত্যকে আধুনিকতার দীক্ষা দিয়াছিলেন।

মধুসূদনের সমসাময়িক কালে আর একজন ক্ষমতাশালী কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি হইতেছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহার 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্ম্মদেবী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্য বিখ্যাত। ভারতচন্দ্রীয় যুগের অথবা কবিওয়ালাদিগের যুগের কুরুচিকে পরিহার করিয়া সাহিত্যে শুচিতা ও শীলতা রঙ্গলাল আনিয়াছিলেন। তিনি ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত ছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যের ভাবধারাকে তাঁহার কাব্যমধ্যে তিনি অভিব্যক্তি দান করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যতদিন না পাশ্চাত্য আদর্শে ও পাশ্চাত্য রচনাভঙ্গীকে আশ্রয় করিয়া বাংলা কবিতা রচনা আরম্ভ হয়, ততদিন বাংলা কাব্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের উদ্বোধন হইবে না। তৎসত্ত্বেও রঙ্গলাল বাংলা কাব্যসাহিত্যের আমূল পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া, বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের উদ্বোধন করিতে পারেন নাই। তবে ভারতচন্দ্রীয় যুগের যে ধারা বাংলা সাহিত্যে তখনও অব্যাহত ছিল, তাহার সংস্কার তিনি সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনায় দেশপ্রীতির কথাও ছিল। কিন্তু এ সকল বৈশিষ্ট্য থাকিলেও তাঁহার সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ছিল না, ভাষা ও ছন্দের তেমন মাধুর্য্য ছিল না। এমন কি মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যের প্রভাবও রঙ্গলালের রচনার উপর সুস্পষ্টভাবে বর্ত্তমান।

কিন্তু রঙ্গলালের সমসাময়িক কালেই অসামান্য প্রতিভা লইয়া বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে মধুসূদন আবির্ভূত হন। হোমার, মিল্টন, সেক্সপীয়র, ট্যাসো, ভার্জিল, ওভিদ প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মধুসূদন বাংলা সাহিত্যকে সম্পূর্ণ নূতন পথে জয়যাত্রা করাইলেন। বিদেশী সাহিত্য হইতে ভাব, কল্পনাভঙ্গী, বর্ণনারীতি, এমন কি ছন্দ পর্য্যন্ত আহরণ করিয়া

মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে নূতন আকর্ষণী শক্তি সঞ্চার করিলেন। গাম্ভীর্য্যে ও ভাব-বৈচিত্র্যে বাংলা কাব্যসাহিত্য সেই প্রথম সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল।

বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত সকল কবিই পয়ার, লাচাড়ী ছন্দে কবিতা বা কাব্য রচনা করিয়া আসিতেছিলেন। ভারতচন্দ্র অবশ্য বহু সংস্কৃত ছন্দে বাংলা কবিতা রচনা করিয়া বাংলা কবিতার ছন্দোবৈচিত্র্য সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদন এ বিষয়ে অসাধ্য-সাধন করিলেন। তিনি মিত্রছন্দের বন্ধন ভঙ্গ করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন করিয়া দেখাইলেন, একই ছন্দে বাঁশীর মৃদুমধুর গুঞ্জরণ হইতে আরম্ভ করিয়া ভেরীর সুগম্ভীর রব পর্য্যন্ত ব্যক্ত করা যায়,—অর্থাৎ একই ছন্দে বীর করুণ প্রভৃতি সকল রকমের ভাব প্রকাশ করা সম্ভবপর। তিনিই প্রথম বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য রচনা করিলেন। তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' মহাকাব্য। তিনিই সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচলিত সনেট-জাতীয় কবিতার আদর্শে 'চতুর্দ্দশপদী কবিতা' রচনা করিলেন। বাংলা সাহিত্যে তিনিই পত্রকাব্য রচনার সূত্রপাত করিলেন। মধুসূদনের 'বীরাঙ্গনা' এই পত্রকাব্য। বৈষ্ণব পদাবলীর আদর্শে তিনি রচনা করিয়াছিলেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য'।

বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগের প্রথম দিকে বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে কবিতা রচনার দুটি ধারা পাশাপাশি চলিয়াছিল। তাহার একটি হইতেছে মহাকাব্য রচনার ধারা, অন্যটি হইতেছে গীতিকবিতা রচনার ধারা। মধুসূদন তাঁহার 'মেঘনাদবধ কাব্য' রচনা করিয়া এই মহাকাব্য রচনার ধারাটিকে বহাইয়া দিয়াছিলেন। মহাকাব্য হইতেছে সেই কাব্য—যাহার মধ্য দিয়া একটি বিরাট ও মহান কাহিনী বর্ণনা করা হয়। সে কাহিনী ইতিহাস কিংবা পুরাণ হইতে গ্রহণ করা হয় এবং দেশের ও জাতির, ধর্ম্মের অথবা দেশের কোন মহান্ ব্যক্তির গৌরবগান করাই মহাকাব্যের লক্ষ্য। সেই উদ্দেশ্য লইয়া বাংলা কাব্যসাহিত্যের প্রথম ভাগে কয়েকজন কবি কয়েকখানি মহাকাব্য রচনা করেন। মধুসূদন ছিলেন ইঁহাদের পথিকৃৎ।

মধুসূদনের পরে একে একে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নবীনচন্দ্র সেন মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্য এবং নবীনচন্দ্র সেনের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—মহাকাব্য। বৃত্রসংহার কাব্য ছাড়া হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বীরবাহু কাব্য, আশাকানন, ছায়াময়ী, দশমহাবিদ্যা নামে কয়েকটি কাব্য এবং ভারত-সঙ্গীত প্রভৃতি বহু খণ্ড কবিতা রচনা করেন। দেশপ্রীতি হেমচন্দ্রের অধিকাংশ কাব্য ও কবিতার মূল সুর। তাঁহার দেশপ্রীতিমূলক কবিতার মধ্যে একটা উদ্দীপনা আছে, এক সময়ে উহা বাঙ্গালীকে বিশেষভাবে মাতাইয়াছিল। মুখ্যতঃ মহাকাব্য রচনার আকাঙ্ক্ষা লইয়া বঙ্গবাণীর দেউলে আবির্ভূত হইলেও অনেক খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতাও হেমচন্দ্র রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাহিনীমূলক কাব্যগুলির মধ্যেও গীতিকবিতার সুর মাঝে মাঝেই অনুরণিত হইয়াছে।

উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ মহাকাব্য রচনার যুগ। এই মহাকাব্য রচনার যুগে আবির্ভূত হইয়া নবীনচন্দ্র সেন মহাভারত অবলম্বন করিয়া তিনখানি মহাকাব্য রচনা করিয়াছিলেন—রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস। এগুলিকে 'উনবিংশ শতকের মহাভারত' বলা হয়। মহাভারতের অনেক ঘটনা তিনি নূতনভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে মহামানবরূপে তিনি দেখিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ খণ্ডিত ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিয়া বলিতেছেন—

বাঁধি ধর্ম্ম-নীতিপাশে
মিলাইব অনায়াসে
জননীর খণ্ড দেহ ; করিয়া চালিত
জ্ঞানাঙ্কুশে, ভেদজ্ঞান করিব রহিত।
এক জাতি, এক ধর্ম্ম,
এরূপে করিব এক সাম্রাজ্য স্থাপন,
সমগ্র মানব প্রজা, রাজা নারায়ণ।

নবীনচন্দ্র কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের প্রচারিত সাম্যের মহিমা বর্ণনা করিয়া কাব্য রচনা করেন নাই। তিনি বুদ্ধদেবের সাম্যবাদের চারুচিত্রও আঁকিয়া গিয়াছেন তাঁহার 'অমিতাভ' কাব্যে। মহাপুরুষ খৃষ্টকে এবং মহাপ্রভু চৈতন্যদেবকে লইয়াও তিনি যথাক্রমে 'খৃষ্ট' ও 'অমৃতাভ' নামে দুখানি কাব্য রচনা করেন। 'অমিতাভে' শাক্যসিংহের জীবনমহিমা, 'খৃষ্টে' যীশুর জীবনগাথা, আর 'অমৃতাভে' শ্রীচৈতন্যদেবের সাম্য ও প্রেমধর্ম্মের বন্দনা। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য—সকল অবতারকেই কবি মানুষের নিকট-আত্মীয় করিয়া দেখাইতে চাহিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পৃথিবীর ও মর্ত্ত্যবাসীর কল্যাণ চাহিয়াছিলেন—নবীনচন্দ্র তাঁহার কাব্যগুলিতে সেই কথাই পরিস্ফুট করিয়া দেখাইয়াছেন।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ'ও বিখ্যাত কাব্য। উহার মধ্যেও দেশপ্রীতির উজ্জ্বল চিত্র আছে। ইহা ঐতিহাসিক কাব্য ও ইতিহাসের কাহিনী লইয়া লেখা।

নবীনচন্দ্রের কাব্যগুলির মূলকথা দেশপ্রীতি। তাঁহার রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, পলাশীর যুদ্ধ, খৃষ্ট, অমিতাভ, অমৃতাভ সর্ব্বত্রই কবির অকুণ্ঠ দেশপ্রীতি উৎসারিত হইয়াছে। কবির 'রঙ্গমতী'ও দেশপ্রীতির আলেখ্য।

এ ছাড়া নবীনচন্দ্র গীতা ও চণ্ডীরও পদ্যানুবাদ করেন এবং ভানুমতী নামে একখানি গদ্য-পদ্যময় উপন্যাস রচনা করেন।

মধুসূদনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্য রচনার যে সাড়া জাগিয়াছিল, নবীনচন্দ্র সেই ধারার অনুসরণ করিলেও তাঁহার মহাকাব্যের মধ্যে গীতি-কাব্যের সুরই বাজিয়াছে। মহাকাব্যে কবির নিজ প্রাণের উচ্ছ্বাস বা ব্যক্তিগত ভাবনা-কল্পনার প্রকাশ থাকে না। কিন্তু নবীনচন্দ্রের মহাকাব্য ব্যক্তিসম্পর্কের রসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং আকার বা গঠন-রীতির দিক দিয়া নবীনচন্দ্রের রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস মহাকাব্য হইলেও, ঐ সকল কাব্যের অন্তর্নিহিত সুর গীতিকাব্যের উপযোগীই হইয়া উঠিয়াছে। পৃথক্‌ভাবেও তিনি গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন।

যে যুগে মধুসূদন, হেম, নবীন প্রভৃতি কবিগণ মহাকাব্য রচনা করিতেছিলেন, ঠিক সেই যুগেই যে কবির বীণায় খাঁটি গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হইয়াছিল, তিনি হইতেছেন বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী। বিহারীলাল কাহিনীমূলক মহাকাব্য রচনার পথ ছাড়িয়া গীতিকাব্য রচনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। মধুসূদন, হেম, নবীনের মত তিনি ইতিহাস অথবা পুরাণ হইতে কাব্যরচনার উপকরণ সংগ্রহ করেন নাই। তিনি নিজের প্রাণের কথা, নিজের উপলব্ধির কথা ও সৌন্দর্য্যবোধের কথা নিজের সুরেই গাহিয়াছিলেন।

বিহারীলাল বাংলা গীতিকবিতাকে আধুনিকতায় দীক্ষা দিয়াছিলেন। আধুনিক কবিদৃষ্টি ও কল্পনাদর্শ অনুযায়ী গীতিকবিতা রচনার পথপ্রদর্শক তিনিই। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন,—"এদেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে আনীত নব-গীতিকবিতার আদি কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী।"

অতি প্রাচীনকাল হইতে বঙ্গসাহিত্যের অন্যতম গৌরবস্থল তাহার গীতিকবিতা। সাময়িকভাবে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মহাকাব্য রচনার একটা উৎসাহ জাগিয়া উঠায় গীতিকবিতা রচনার সেই ধারা খানিকটা ব্যাহত হইলেও তাহা লুপ্ত হয় নাই। এমন কি মধুসূদন, হেম, নবীনের মহাকাব্যগুলিতেও যে একটি প্রচ্ছন্ন গীতিকবিতার সুর ধ্বনিত হইয়াছিল তাহা আমরা দেখিয়াছি। প্রকাশ্যভাবেও তাঁহারা অনিন্দ্যসুন্দর গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন। এ যুগের গীতিকবিতার সেই সুরটি আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া বিহারীলালের কাব্যের মধ্য দিয়া পূর্ণ পরিণত রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। নব-গীতিকবিতার সেই বেণুবীণানিক্কণে সমগ্র বাংলা কাব্যসাহিত্য প্লাবিত হইয়া গেল।

বিহারীলালের বিখ্যাত কাব্য 'সারদামঙ্গল' ও 'সাধের আসন'। 'বঙ্গ সুন্দরী', 'নিসর্গ সন্দর্শন' প্রভৃতিও কবির সার্থক সৃষ্টি। অনেক খণ্ড খণ্ড কবিতা ও গানও তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

বিহারীলালের প্রতিভার অন্যতম বিশিষ্টতা এই যে, মহাকাব্যরচনার যুগে আবির্ভূত হইয়াও তিনি নবগীতিকবিতার সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন এবং

উত্তরকালের কয়েকজন ক্ষমতাশালী কবিকে,—যেমন দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল এবং রবীন্দ্রনাথকে তাঁহার কাব্যমন্ত্রে দীক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কবি বিহারীলালকে তাঁহার গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন তাঁহার একটি রচনায়। বিহারীলালের কাব্যে এমন অনেক লক্ষণ আছে, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনাভঙ্গীতে এমন অনেক বিশেষত্ব আছে, যাহা রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করিয়াছে, অথবা যাহা রবীন্দ্রকাব্যে পুষ্টি লাভ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথে বাংলা কাব্যসাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ। তাঁহার কবিপ্রতিভা বাংলার কাব্যসাহিত্যে একটা যুগান্তর আনিয়াছে। বাংলার কাব্যসাহিত্যকে বিচিত্রতার আস্বাদ দিয়া তিনি সঞ্জীবিত করিয়া গিয়াছেন। যে ভাষায় কাব্যসাহিত্যে বৈচিত্র্য ছিল না, যে ভাষায় একদিন শুধু ক্ষীণধ্বনি একতারার সুর বাজিত, তাহাতে তিনি বীণাযন্ত্রের সুরলহরী ধ্বনিত করিয়া গিয়াছেন। কত নূতন নূতন ছন্দ তিনি উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন! তাঁহার কবিতায় ভাষা ও ভাবের ঐশ্বর্য্যই বা কত! কোনো একটি বিশেষ বিষয়, সুর বা কল্পনাকে অবলম্বন করিয়া তাঁহার কাব্য গড়িয়া উঠে নাই। তাহা যদি উঠিত, তবে তাঁহার কাব্য প্রাণহীন হইত—বৈচিত্র্যহীন হইত; গতি এবং বেগ—প্রাণ এবং পরিবর্ত্তন রবীন্দ্রকাব্যের বিশেষত্ব।

রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব উন্মেষের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া চিরদিনই তাঁহার কবিতা নব নব রূপ পরিগ্রহ করিতে করিতে চলিয়াছিল। তিনি অসংখ্য কবিতা, কাব্য ও গান রচনা করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাসঙ্গীত, প্রভাত সঙ্গীত, ছবি ও গান, কড়ি ও কোমল, কথা ও কাহিনী, মানসী, সোনার তরী, কল্পনা, কণিকা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, মহুয়া, বনবাণী, পুনশ্চ, পরিশেষ, বীথিকা, শেষ-সপ্তক, পত্রপুট প্রভৃতি কত কাব্যই না তিনি রচনা করিয়া গিয়াছেন! প্রত্যেক কাব্যে কবির কল্পনা ও চিন্তাধারার বিশিষ্টতা আছে। কোথাও তিনি গতির জয়গান করিয়াছেন, কোথাও মানুষের অনুভূতিকে এবং জীবনকে অথবা মৃত্যুকে নব নব রূপ ও রূপক

দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, কখনও আধ্যাত্মিক ভাবের গান অথবা কবিতা রচনা করিয়াছেন। এমন সব প্রকৃতিবিষয়ক কবিতা রচনা করিয়াছেন—এমন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া প্রকৃতিকে দেখিয়াছেন বা উপলব্ধি করিয়াছেন,—যে দৃষ্টিভঙ্গী ও উপলব্ধির ভঙ্গী বঙ্গসাহিত্যে রবীন্দ্রপূর্ব্বযুগে ছিল না বলিলেই হয়। এ বিষয়ে সামান্য একটু উদাহরণ দেওয়া যাউক :—

রবীন্দ্রপূর্ব্বযুগে কবিদিগের নিকট প্রকৃতি ছিল জড়। তখন কবিগণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে একটা প্রাণস্পন্দন বা বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গেও যে মানবচিত্তের একটা আত্মীয়তার যোগ আছে, তাহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু জল-স্থল-আকাশের সহিত একটা নিবিড় একাত্মতা ও নিজেকে বিশ্বপ্রকৃতির শোভা-সৌন্দর্য্যের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া বিলাইয়া দিবার ব্যাকুলতা রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষত্ব। এই কল্পনাভঙ্গীটি রবীন্দ্রনাথের বিশ্বপ্রকৃতি-সম্বন্ধীয় কবিতায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্য দান করিয়াছে—তাঁহার সৃষ্টিকে সকল পূর্ব্বজ কবির সৃষ্টি হইতে পৃথক করিয়াছে। তিনি বিশ্বপ্রকৃতিকে আত্মীয়রূপে উপলব্ধি করিয়া লিখিয়াছেন— স্থলে-জলে আমি হাজার বাঁধনে

বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

এবং বিশ্বপ্রকৃতির সহিত তাঁহার যে সম্বন্ধ তাহা শুধু ইহজীবনের নহে, জন্ম-জন্মান্তরের—

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের! তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গগনে
অশ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিতৃমণ্ডল, অসংখ্য রজনী দিন
যুগ-যুগান্তর ধরি'।—(বসুন্ধরা—সোনার তরী)

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে এই জিনিসটি চোখে পড়ে যে, সাহিত্যক্ষেত্রে কোন একটি নূতন ভঙ্গী বা আদর্শের প্রবর্ত্তন করিয়াই যে কোন সাহিত্যস্রষ্টা যুগপ্রবর্ত্তক রচয়িতা বলিয়া সমাদৃত হইয়াছেন। কিন্তু রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে যে কত নূতন নূতন ভঙ্গী, কত নূতন নূতন রসসৃষ্টির

আদর্শ রহিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। রবীন্দ্রনাথের সকল সৃষ্টিতেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর, কল্পনাভঙ্গীর ও প্রকাশভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু বাংলা কাব্যসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে বা বৈচিত্র্যবিধানে নয়, বাংলা কাব্যসাহিত্যক্ষেত্রে এক নবযুগের উদ্বোধনে রবীন্দ্রপ্রতিভাই কার্য্যকরী হইয়াছিল। তাই এ যুগকেই বলা হয় রবীন্দ্রযুগ।

এই রবীন্দ্রযুগের প্রথম ভাগে যাঁহারা কবিখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, ভাওয়ালের গোবিন্দচন্দ্র দাস ও রজনীকান্ত সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালে এবং তাঁহার পরেও বাংলা কাব্যজগতে বহু কবির আবির্ভাব হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, মোহিতলাল মজুমদার, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে হয়। ইঁহাদের মধ্যে কেহ বা রবীন্দ্র-অনুগামী, কাহারও কাহারও মধ্যে স্বাতন্ত্র্যও রহিয়াছে। রবীন্দ্রপ্রভাবকে অতিক্রম করিয়া যাঁহারা কাব্য রচনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদার ও যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত অন্যতম।

রূপ এবং সৌন্দর্য্যোপলব্ধিতে মোহিতলাল এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন। সে দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথ হইতে ভিন্ন। যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত নৈরাশ্যের কবি। রবীন্দ্রনাথের মত তিনি আশাবাদী নহেন। রবীন্দ্রনাথের মত নিছক কল্পনাপ্রবণতাও তাঁহার মধ্যে নাই। কল্পনাপ্রবণতার ও বাস্তবতার এক অপরূপ সমন্বয় যতীন্দ্রনাথে। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পীড়নে মানবাত্মার ক্রন্দন ও হতাশ্বাস তাঁহার কাব্যের মূল সুর।

রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে কয়েকজন কুশলী মহিলা কবিও আবির্ভূত হইয়া কাব্যরচনা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কামিনী রায়, মানকুমারী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, রাধারাণী দেবী প্রভৃতির নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালেই—বিশেষতঃ ১৯৩০ সাল হইতে বাংলার কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে একদল কবি নূতন ধরণের কবিতা রচনা করিয়াছেন বা করিতেছেন। তাঁহাদিগকে অতি-আধুনিক কবিরূপে আখ্যাত করা হয়। ইঁহাদের অধিকাংশই রবীন্দ্রপ্রভাব হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া, রবীন্দ্রনাথ যে কল্পনাপ্রবণ আশাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া জগৎ ও জীবনকে দেখিয়াছিলেন সেই দৃষ্টিভঙ্গী পরিত্যাগ করিয়া,—নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে পৃথিবী ও মানবজীবনের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনারীতির বিরুদ্ধে যেন একটা বিদ্রোহের সুর ইঁহাদের মধ্যে ধ্বনিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে কল্পনাপ্রবণ স্বপ্নময় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, তাহাকে বর্জ্জন করিয়া, জীবনের বাস্তবতার প্রতি ইঁহারা দৃষ্টি ফিরাইয়াছেন। বর্ত্তমানকালের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে যে বেদনা, যে নৈরাশ্য, হাহাকার ও কদর্য্যতা জমিয়া উঠিয়াছে, সেই রূঢ় বাস্তবের প্রতি এই সকল কবি আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছেন। বাস্তবের রূঢ়তা এই সকল কবির মধ্যে সুন্দরের সকল স্বপ্নকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। তাই ইঁহাদের কবিতার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে একটা বিরাট জিজ্ঞাসা,—কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও দুঃখ-দুর্দ্দশা-মোচনের বিদ্রোহ। এই সকল কবির অনেক কবিতাই আবার প্রতীকধর্ম্মী। কেহ কেহ আবার পদ্যের ছন্দে ভাব ব্যক্ত না করিয়া, গদ্যচ্ছন্দে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। এই গদ্যচ্ছন্দের উদ্ভাবক অবশ্য অতি-আধুনিক কবিগণ নহেন। রবীন্দ্রনাথই ইহার প্রথম ব্যবহার করেন। রবীন্দ্র-নাথের পুনশ্চ, পত্রপুট প্রভৃতি গদ্যচ্ছন্দে রচিত কাব্য। অতি-আধুনিক কবিগণের মধ্যে অনেকেই গদ্যচ্ছন্দেই বাস্তবকে ফুটাইয়া তুলিতেছেন।

অতি-আধুনিক কবিদের মধ্যে যাঁহাদের সৃষ্টির প্রেরণা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, যাঁহাদের কল্পনা বা বর্ণনাভঙ্গী বলিষ্ঠ, তাঁহারা হইতেছেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি।

এইরূপে প্রায় হাজার বছরের সাধনার ফলে,—বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের দানে বাংলা সাহিত্য ক্রমশঃ এমন বিচিত্র ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহা আজ বিশ্বসাহিত্যের আসরে একটি সম্মানের আসন করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছে।